রাজনৈতিক আদর্শ

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

চিরায়ত গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজনৈতিক আদর্শ

বার্ট্রান্ড রাসেল

অনুবাদ

আবুল কাসেম ফজলুল হক

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৪২৭

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪২১ জানুয়ারি ২০১৫

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
চৈত্র ১৪২৩ এপ্রিল ২০১৭

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0426-3

RAJNOITIK ADORSHO
Bengali translation of 'Political Ideals' by Bertrand Russell
Translated by Abul Quasem Fazlul Huq
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh
Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com
Price : Tk. 150.00 only

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশে
যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন
— যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করবেন।

[ঘটনাপ্রবাহ এখন সম্পূর্ণরূপে আত্মোদরসর্বস্বদের
দখলে! এ পথ তো ইতিহাস সৃষ্টির পথ নয়।
সৃষ্টির পথে উত্তীর্ণ হতে হবে]

'এই কথাটি মনে রেখো তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় ॥
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে আপন মনে
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় ॥
দিনের পথিক মনে রেখো আমি চলেছিলাম রাতে
সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বর্ট্রান্ড রাসেল [১৮৭২-১৯৭০]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদ প্রসঙ্গে

(প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৩, থেকে)

১৯৬৩ সনে বার্ট্রান্ড রাসেলের *Political Ideals* বইটি আমি প্রথম পড়ি, এবং এ বইয়ের মধ্য দিয়েই রাসেলের চিন্তাধারার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত। প্রথম পাঠে এ বইতে প্রকাশিত চিন্তা আমার মনে অনেক নতুন জিজ্ঞাসার তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে মানুষের জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র অনেক সুন্দর হতে পারে। প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, সকল প্রতিষ্ঠান ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সকল রূপকে তখন নতুন নিরিখে পরীক্ষা করে দেখার একটা স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ নিজের মধ্যে অনুভব করি।

মালিকানালিপ্সা, আধিপত্যবোধ, শঠতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বলপ্রয়োগের প্রবণতাকে গৌণ করে দিয়ে সৃজনীতাড়নার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা দ্বারাই যে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার ওপর ভিত্তিশীল সত্যিকার সুখী-সুন্দর-প্রগতিশীল সমাজ ও উন্নততর নতুন পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব, এ বইতে রাসেল তাই বলতে চেয়েছেন। মানবচৈতন্যের অমঙ্গলকর প্রবণতাসমূহ বাস্তব অবস্থার সুযোগেই আত্মপ্রকাশ করে। সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন স্থান-কালে, বিভিন্ন অবস্থায় এগুলো বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। তাই রাসেলের মত : মানুষের মনের অমঙ্গলকর প্রবণতাগুলোকে দমন করে কল্যাণকর প্রবণতাসমূহের বিকাশ ঘটাতে হলে তার পূর্বশর্ত হচ্ছে বাস্তব পরিবেশের অনুকূল পরিবর্তন সাধন। সে জন্য রাসেলের মতে উৎপাদনযন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ও সামাজিক মালিকানায় সেগুলোর যথার্থ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণই শ্রেষ্ঠ পন্থা। চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা, মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নির্মূল করা প্রভৃতি বিষয়ে রাসেল এ বইতে যেসব বক্তব্য উত্থাপন করেছেন, সেগুলো একদিকে তাঁর পরবর্তী জীবনের বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী, অপরদিকে তাঁর উত্তরসাধকদের জন্য নতুন চিন্তার খোরাকবাহী।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে রাসেল তাঁর বহুমুখী প্রতিভার যে ফসল পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন, তার অঙ্কুর দেখতে পাওয়া যায় এ বইতেই। এ জন্য রাসেলকে বোঝার ক্ষেত্রে এ বই বিশেষ মূল্যবান। পরবর্তীকালে রাসেলের চিন্তার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে এবং নানা প্রসঙ্গে রাসেল নিজেও তা উল্লেখ করেছেন। রাসেলের চিন্তাধারার সঙ্গে আমার যে সামান্য পরিচয়, তাতে বলতে পারি, প্রথমজীবনে রাসেল জীবন ও জগতের প্রতি যে দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলেন, পরবর্তী জীবনে তাঁর সেই দৃষ্টিই আরো প্রখর, গভীর ও সম্প্রসারিত হয়েছে, তাঁর বিশ্বদৃষ্টিতে কোনো আমূল পরিবর্তন ঘটেনি। বলা বাহুল্য, বর্তমান পুস্তকে তাঁর চিন্তার যে অভিব্যক্তি ঘটেছে, তার সঙ্গে তাঁর পরবর্তী জীবনের চিন্তার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, দেখা যায়, রাসেলের সমাজদর্শন মূলত এইসব চিন্তারই সম্প্রসারণ। রাসেলের মূল সমাজদর্শন, আমার মনে হয়, তাঁর *Power* বইটিতে বিধৃত। উক্ত বইটিতে তাঁর বক্তব্য : মানুষের কর্মপ্রেরণার উৎসমূলে ক্ষমতা ও গৌরব লাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রধান চালিকাশক্তি। ক্ষমতা ও গৌরব— কথা দুটিকে সেখানে তিনি গতানুগতিক অর্থে ব্যবহার করেননি, গোড়াতেই তার ব্যাখ্যা দিয়ে নিয়েছেন। আমার মনে হয়, ফ্রয়েডের দর্শনে যৌনতাড়নার যে স্থান, রাসেলের দর্শনে ক্ষমতা ও গৌরবের আকাঙ্ক্ষার সেই স্থান। উল্লেখযোগ্য যে, যৌনতাড়না সম্পর্কে ফ্রয়েডের ধারণায় প্রায় সকল মানবীয় প্রবৃত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মূল বইটিতে এমন দু-একটি পাদটীকা আছে যেগুলো, মনে হয়, প্রথম মুদ্রণে ছিল না, পরবর্তী কোনো মুদ্রণে সংযোজিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে, মূল বইটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) চলাকালে রচিত এবং ১৯১৭ সালে প্রথম প্রকাশিত।

১৯৬৩ সনে বইটি প্রথম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদিকে সমাজদর্শন অধ্যয়নের প্রতি নিজের ভিতর থেকে একটা তীব্র তাগিদ অনুভব করি; এর অপরদিকে আমার মনে স্বদেশ ও বিশ্বের চলমান ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়ায় বইটিকে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার আগ্রহ জাগে। বইটির অনুবাদে তখনই হাত দিই এবং অল্পদিনের মধ্যেই অনুবাদ শেষ করি, এবং পাঁচটি অধ্যায়ের তিনটি মাসিক *পূবালী*-তে, একটি *দৈনিক পাকিস্তান*-এ ও একটি *দৈনিক আজাদ*-এ প্রকাশিত হয়। তারপর অনুবাদিত প্রবন্ধগুলোর কোনো কোনোটি আরও কোথাও কোথাও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সমাজবিকাশের যে পর্যায়ে এখন আমরা আছি তাতে রাসেলের এ বইয়ের চিন্তা আমাদের সমাজপ্রগতির সহায়ক হতে পারে— এই

www.pathagar.com

ধারণায়ই এ বই আমি অনুবাদ করেছিলাম। যদিও রাসেলের বিশ্বদৃষ্টির সঙ্গে এখন আমি একাত্মতা অনুভব করি না তবু এ বই প্রকাশ করার তাগিদ আমি অনুভব করছি এই ভেবে যে, এ বইয়ের চিন্তাধারা সাধারণভাবে আমাদের সমাজপ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে।

পুস্তকাকারে প্রকাশের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের আগে জনাব বশীর আল হেলাল গভীর আন্তরিকতা ও পরিশ্রম সহকারে আমার অনুবাদের উৎকর্ষ ঘটাতে চেষ্টা করেছেন। পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করতে গিয়ে সমস্তটা অনুবাদ পুনরায় পরীক্ষা করলাম ও উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করলাম। তবু অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তো রয়ে গেছে।

এই অনুবাদগ্রন্থটি যদি বাংলাভাষী পাঠকদের প্রকৃতপক্ষে সামান্য প্রয়োজনেও লাগে তাহলেই আমি আমার শ্রমকে সার্থক মনে করতে পারব।

আবুল কাসেম ফজলুল হক
ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

(দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৮, থেকে)

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে গিয়ে সমগ্র বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি এবং ভাষা থেকে ইংরেজি বাক্যরীতির প্রভাব দূর করতে চেষ্টা করেছি। অন্যান্য ত্রুটিও অনুসন্ধান করেছি এবং যতদূর পেরেছি সংশোধন করেছি। সুযোগ পেলে বইটির নির্ভুল ও পরিচ্ছন্ন মুদ্রণের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এ সংস্করণ যদি পূর্ববর্তী সংস্করণের তুলনায় কিছুমাত্রও উৎকর্ষের অধিকারী হয়ে থাকে, তা হলেই শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

৬ নীলক্ষেত রোড, ঢাকা-২
২৪ এপ্রিল ১৯৭৮

আবুল কাসেম ফজলুল হক

তৃতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

(তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮২, থেকে)

তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থের শেষে 'রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি-প্রবৃত্তি' নাম দিয়ে বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি প্রবন্ধের অনুবাদ সংযোজন করেছি। সংযোজিত প্রবন্ধের বক্তব্য গ্রন্থের বক্তব্যের পরিপূরক; অধিকন্তু মানুষের আচরণ সম্পর্কে যে ধারণার ভিত্তিতে রাসেলের রাজনৈতিক চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে, এই প্রবন্ধটিতে রয়েছে তারই পরিচয়। সংযোজনের পেছনে এসব বিবেচনাই কাজ করেছে। রাজনৈতিক সমস্যা বিচারে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মনোজগতের বিষয়াদির বিবেচনাও যে কত গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্পর্কে এ প্রবন্ধ পাঠকের মনে গভীর উপলব্ধি জাগায়।

www.pathagar.com

অনুবাদিত এই প্রবন্ধটি আমার সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ১৯৭৭ সনের *একুশের সংকলন*-এ এবং ১৯৮০ সনের একুশে ফেব্রুয়ারিতে আবুল হোসেন খান সম্পাদিত *সন্ধিক্ষণ* নামক সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল। *সন্ধিক্ষণে* যে মন্তব্য যোগ করেছিলাম তা হল :

বর্ট্রান্ড রাসেলকে (১৮৭২-১৯৭০) "বিভিন্নমুখী তাৎপর্যপূর্ণ রচনাবলির মাধ্যমে লোকহিতকর আদর্শ ও চিন্তার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠ সংগ্রামীর ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি হিসেবে" সুইডিশ একাডেমি ১৯৫০ সনে নোবেল পুরস্কার (সাহিত্য) প্রদান করে। ১৯৫০ সনের ১১ ডিসেম্বর স্টকহল্‌মে অনুষ্ঠিত এই পুরস্কার-অনুষ্ঠানে রাসেল 'রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি-প্রবৃত্তি' বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন, নিচের রচনাটি তারই অনুবাদ। রাসেলের বিশ্বদৃষ্টির সমর্থক না হয়েও এবং এই বক্তৃতার কোনো কোনো বক্তব্য যে খণ্ডনযোগ্য তা জেনেও, এটি আমি অনুবাদ করেছি এই বিবেচনায় যে, এতে জীবন ও সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এমন এক দিকে আলোকপাত করা হয়েছে যে দিকটি আমাদের দেশে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মোটেই বিবেচিত হয় না। আমার ধারণা, বাংলাদেশে যাঁরা উন্নততর নতুন জীবন ও সমাজ প্রতিষ্ঠার চিন্তায় ও কর্মে নিয়োজিত, দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা সত্ত্বেও এ বিষয়টির প্রতিও তাঁদের দৃষ্টি প্রদান জরুরি। এই অনুবাদিত লেখাটি এ বিষয়ের প্রতি তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হতে পারে— এই ধারণাবশেই এটি অনুবাদ করেছি। এই বক্তৃতাটির কেবলমাত্র প্রথম বাক্যটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করে এবং বাকি অংশ সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে রাসেল এটিকে তাঁর *হিউম্যান সোসাইটি ইন এথিক্‌স্ অ্যান্ড পলিটিক্‌স্* গ্রন্থে একটি অধ্যায়রূপে গ্রন্থিত করেছেন।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আবুল কাসেম ফজলুল হক
১২. ১১. ১৯৮১

www.pathagar.com

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মুদ্রণ

জাগৃতি প্রকাশনী থেকে ২০০২ সালে দ্বিতীয়বার এবং ২০১২ সালে তৃতীয়বার গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলো ছিল প্রথম জাগৃতি মুদ্রণেরই পুনর্মুদ্রণ। বর্তমান গ্রন্থ তৃতীয় জাগৃতি মুদ্রণের পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গ্রন্থটি প্রকাশ করছে বলে আমি আনন্দিত। এজন্য আমি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের নিকট কৃতজ্ঞ। জনাব আলাউদ্দিন সরকার গ্রন্থটির নির্ভুল ও সুন্দর মুদ্রণের জন্য যত্ন নিয়েছেন। সেজন্য তাঁর প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

৯/এ পরিবাগ গার্ডেন টাওয়ার
১ পরিবাগ, ঢাকা ১০০০

আবুল কাসেম ফজলুল হক

www.pathagar.com

ভূমিকা

(প্রথম জাগৃতি মুদ্রণ, ১৯৯৮, থেকে)

বিজ্ঞানের আবিষ্কার-উদ্ভাবন, প্রযুক্তির বিকাশ, নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদির ফলে বিগত দুই দশকে মানুষের জীবনযাত্রায়, রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও বিশ্বব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে গেছে। টেলিভিশন, ফটো-কপিয়ার, টেলিফোন, কম্পিউটার. ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট, উচ্চফলনশীল বীজ, হাঁস-মুরগি-মাছ ও গরুর ফার্মিং ইত্যাদির প্রসার এবং জীবনযাত্রায় এগুলোর ব্যবহার আর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থার ভাঙা-গড়া ইত্যাদি বর্ণনা করতে হলে বিরাট পরিসর দরকার। সরকারি প্রতিষ্ঠানের (GO) পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO) ও সিভিল সোসাইটি প্রবর্তন; রাজনীতিতে মৌলবাদ ও ধর্মকেন্দ্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া; মানববাদের (Humanism) বিরুদ্ধে নারীবাদ (Feminism), পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের ভেঙে পড়া, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার স্থলে মুক্তবাজার অর্থনীতি, নেতৃত্বের (leadership) বদলে সুশাসনের ধারণা (governance) ইত্যাদির প্রসার বিশ্বব্যাপী বদলে দিয়েছে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি। বিজ্ঞানের মহান সব আবিষ্কার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আধিপত্যবাদী ও শোষণবাদী অপশক্তির হীনস্বার্থ হাসিলের কাজে— জনগণের ন্যায়স্বার্থের বিরুদ্ধে। বাহ্যজগতের পরিবর্তনের চেয়ে মানুষের অন্তর্জগতের পরিবর্তন মোটেই কম যুগান্তকারী নয়। মনের দিক দিয়ে পৃথিবীর দশভাগের নয়ভাগ মানুষ হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। হতাশার ব্যাধি দারুণভাবে গ্রাস করেছে অধিকাংশ মানুষের জীবনকে। সুপরিকল্পিতভাবে জাগিয়ে তোলা হয়েছে পুরাতন সব অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও অদৃষ্টবাদকে। পরিবর্তনের এই ঘূর্ণিপাকে পড়ে সাধারণ মানুষের বৈষয়িক অবস্থা সামান্য উন্নত হলেও বঞ্চনা ও অসহায়ত্ব বেড়েছে। মুক্তির পথ যাঁরা সন্ধান করেন তাঁরা বিচলিত, অস্থির, উৎকণ্ঠিত। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ধারণা

www.pathagar.com

কি উপযোগিতা হারিয়েছে? মুক্তবাজার অর্থনীতি আর সিভিল সোসাইটির ধারণা কি সমৃদ্ধ-সুন্দর জনজীবন প্রতিষ্ঠার অবলম্বন হতে পারে? প্রগতি কোন পথে? এসব প্রশ্ন আজ মানবজাতির সামনে সবচেয়ে গুরুতর ও কেন্দ্রীয়-গুরুত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাস্তবে, জনস্বার্থে, প্রগতিশীল চিন্তার জগতে দেখা দিয়েছে স্থবিরতা। উত্তরণের প্রয়াস দানা বেঁধে ওঠার আগেই ভেঙে পড়ছে। এই পরিবেশে দরকার ইতিহাসের আশ্রয়ে, thesis-antithesis-synthesis-এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক হয়ে, অতীতের মহান সব চিন্তাধারা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, বাস্তব সম্ভাবনার হিসাব নিয়ে উন্নত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে নতুন সৃষ্টিপ্রয়াস। আমাদের ধারণা, এক্ষেত্রে আজ অন্যান্য চিন্তাধারার সঙ্গে বার্ট্রান্ড রাসেলের চিন্তাধারাকেও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় ধরা দরকার। এই ধারণাবশেই আবার এ গ্রন্থ প্রকাশ করা হল।

রাসেল রাজনীতির প্রশ্নে আজীবন উৎসুক ছিলেন, রাজনৈতিক ঘটনার পর্যালোচনায় তাঁর অভিজ্ঞতা বিস্তর, দুইবার তিনি গ্রেট ব্রিটেনের হাউজ অব লর্ডসের সদস্য ছিলেন, প্রায় শত বৎসরের (১৮৭২-১৯৭০) জীবনে একাধিকবার তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে কারাবরণ করেছেন, রাজনীতি ও সমাজদর্শন বিষয়ে তাঁর চিন্তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি দেখে বিস্মিত হতে হয়। চলতি উত্তেজনা ও উপস্থিত অস্থিরতায় কখনও হারিয়ে যায়নি তাঁর চিন্তা। তাঁর রচনায় বিধৃত সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও উইট-হিউমার তাঁর পাঠককে মুগ্ধ করে। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের গভীরতর সমস্যাবলি উপলব্ধি করার কাজে এবং শোষণ-পীড়ন-প্রতারণার মোকাবিলায় তাঁর চিন্তা পাঠকের মনে নতুন প্রশ্ন জাগায়। রাসেল থেকে আজ আমরা আমাদের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান পাব— তা নয়, তবে আমাদের সমস্যাবলি সমাধানের উপায় সন্ধানে রাসেলের চিন্তা আমাদের সহায়তা করবে। এর মূল্য আজ অপরিসীম।

বাংলা অনুবাদে *রাজনৈতিক আদর্শ* নামে রাসেলের এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সনের মে মাসে। তারপর ভাষা পরিমার্জন করে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করি ১৯৭৮ সনে। ওই দুই সংস্করণে কেবল *Political Ideals* গ্রন্থেরই অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সনে। তখন মূল বইয়ের সঙ্গে 'রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি-প্রবৃত্তি' শিরোনামে রাসেলের নোবেল পুরস্কার গ্রহণকালের বক্তৃতা— What desires are Politically Important? লেখাটির বাংলা অনুবাদ সংযোজন করি। তিনটি সংস্করণই প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার বাংলা একাডেমি থেকে।

www.pathagar.com

সুইডিশ একাডেমি ১৯৫০ সনে রাসেলকে নোবেল পুরস্কার (সাহিত্য) প্রদান করে "বিভিন্নমুখী এবং তাৎপর্যপূর্ণ রচনাবলির মাধ্যমে লোকহিতকর আদর্শ ও চিন্তার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠ সংগ্রামীর ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি হিসেবে।" রাসেলের নোবেল পুরস্কার গ্রহণকালের বক্তব্য এই গ্রন্থের বক্তব্যের সম্পূরক ও সম্প্রসারণ; অধিকন্তু মানুষের আচরণ সম্পর্কে যে ধারণার ভিত্তিতে রাসেলের রাজনৈতিক চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে, এ প্রবন্ধে তারও পরিচয় রয়েছে। এই বক্তব্যকে গণতন্ত্রের জন্য আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। রাজনৈতিক সমস্যা বিচারে, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের বিবেচনাও যে কত গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্পর্কে এ প্রবন্ধ পাঠকের মনে গভীর উপলব্ধি জাগায়। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মনোজগতের বিষয়াদি আজো মোটেই বিবেচনা লাভ করে না। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর এই বক্তৃতার কেবল প্রথম বাক্যটি আংশিক পরিবর্তন করে বাকি সবটা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে তাঁর *Human Society in Ethics and Politics* গ্রন্থে Politically Important Desires নামে একটি অধ্যায়রূপে গ্রন্থিত করেছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এ গ্রন্থ যদি বাংলাভাষী মুক্তিকামী জনগণের মুক্তির সাধনা ও সংগ্রামে কোনো কাজে লাগে, তা হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাস
৬ নীলক্ষেত রোড, ঢাকা-১০০০

আবুল কাসেম ফজলুল হক
১২.১২.১৯৯৭

www.pathagar.com

অতি সাধারণ অথচ প্রচণ্ড শক্তিশালী তিনটি আবেগ আমার জীবনকে পরিচালিত করেছে : প্রেমের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞানের জন্য অনন্ত অনুসন্ধিৎসা, এবং মানবজাতির দুঃখকষ্টের জন্য অসহনীয় মর্মবেদনা। এই আবেগগুলো দুর্নিবার ঝড়ের বেগে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে স্বেচ্ছাচারী পথে, যন্ত্রণার গভীর সমুদ্রে, হতাশার একেবারে শেষ প্রান্তে।

প্রেমের জন্য আকুল হয়েছি তার প্রথম কারণ, প্রেম এমনই এক পরমানন্দের সন্ধান দেয় যে, সেই মহান আনন্দ কয়েক ঘণ্টার জন্য পেলে বাকি সমস্ত জীবন আমি তার জন্য উৎসর্গ করতাম। প্রেমের জন্য আকুল হয়েছি তার দ্বিতীয় কারণ, প্রেম একাকিত্বের অবসান ঘটায়— সেই ভয়াবহ একাকিত্ব যার মধ্যে পড়ে মানুষের শিহরিত চৈতন্য সমস্ত পৃথিবীকে উপেক্ষা করে শীতল প্রাণহীন অতল গহ্বরে ধাবিত হয়। প্রেমের জন্য আকুল হয়েছি তার শেষ কারণ, প্রেমময় মিলনে আমি দেখেছি ঋষি ও কবিরা স্বর্গের যে কল্পচিত্র এঁকেছেন তারই এক রহস্যময় ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি। এরই জন্য আমি আকুল হয়েছি, এবং যদিও এই প্রেমকে মানবজীবনে দুর্লভ মনে হয় তবু শেষ পর্যন্ত এর সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি।

একই রকম প্রচণ্ড আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে আমি জ্ঞান সন্ধান করেছি। আমি বুঝতে চেয়েছি মানুষের অন্তরকে। আমি জানতে চেয়েছি জ্যোতিষ্কেরা কেন আলো দেয়। আমি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি পিথাগোরিয়ান ঘাত যার দ্বারা সংখ্যা নিরন্তর-পরিবর্তনশীল সংখ্যার পরিবর্তনের হারের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। যা সন্ধান করেছি তার অতি সামান্য অংশই আমি অর্জন করেছি।

প্রেম ও জ্ঞান, যতদূর সম্ভব হয়েছে, আমাকে আকাশচারী করেছে। কিন্তু সবসময় পরদুঃখকাতরতা আমাকে আবার মাটিতে টেনে এনেছে। যন্ত্রণার কান্নার শব্দ আমার প্রাণে প্রতিধ্বনি হয়ে বাজে। মানবজীবন যেমনটি হওয়া উচিত, তার প্রতি দুর্ভিক্ষে নিপতিত শিশু, অত্যাচারীর পীড়নে নিষ্পেষিত মানুষ, নিজের সন্তানের কাছে ঘৃণিত বোঝাস্বরূপ অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নিঃসঙ্গতা, দারিদ্র্য ও যন্ত্রণায় ভরা সমস্তটা পৃথিবী বিদ্রূপের অট্টহাসি হাসে। অশুভের অপনোদনের চেষ্টায় আমি আকুল হই, কিন্তু পারি না, এবং আমি নিজেও যন্ত্রণায় কাতর হই।

এই-ই আমার জীবন। এ জীবন আমার কাছে যাপনযোগ্য মনে হয়েছে, এবং যদি আবার সুযোগ পেতাম তাহলে সানন্দে আবার আমি এই জীবনযাপন করতাম।

বার্ট্রান্ড রাসেল

(আত্মজীবনীর মুখবন্ধ : ১৯৬৭)

www.pathagar.com

প্রাগুক্তি

এ বইয়ের রচনা ১৯১৭ সনে। কিন্তু তখন এটি প্রকাশিত হয়েছিল কেবল আমেরিকায়। বক্তৃতাদানের উদ্দেশে এই প্রবন্ধগুলো লিখেছিলাম। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের সমর বিভাগ তা হতে দেয়নি। প্রথম অধ্যায়টি রচনা করেছিলাম খনি শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি রবার্ট স্মাইলির সভাপতিত্বে গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতাদানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বক্তৃতা প্রদানের ঠিক পূর্বমুহূর্তে সরকার 'সংরক্ষিত এলাকা' বলে ঘোষিত অঞ্চলগুলোতে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। গ্লাসগোকেও করা হয়েছিল এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

সমুদ্রোপকূলের সবটাই ছিল 'সংরক্ষিত এলাকা'র আওতায়, এবং এই আদেশের উদ্দেশ্য ছিল গুপ্তচরদের দমন করা— যাতে জার্মান সাবমেরিনে তারা কোনো তথ্য পাচার করতে না পারে। সমর বিভাগ অবশ্য দয়া করে আমাকে জানিয়েছিল যে, তারা জার্মানদের গুপ্তচর বলে আমাকে সন্দেহ করে না। আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ শুধু এটাই ছিল যে, যুদ্ধ থামাবার অভিপ্রায়ে শিল্প এলাকায় আমি যুদ্ধবিরোধী উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলাম।

এমতাবস্থায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আমার অনিবার্য অনুপস্থিতিতে স্মাইলিই সভায় আমার কাজ চালিয়ে নেবেন। প্রকৃতপক্ষে স্মাইলি সেদিন সে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা ছিল আমারই বক্তৃতা— যা আমি নিজে দেব বলে স্থির করেছিলাম। শ্রোতারা সেদিন স্মাইলির বক্তৃতার স্টাইলের ভিন্নতা দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু বক্তৃতা শেষ করেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমার বাজেয়াপ্ত বক্তৃতাই তিনি এতক্ষণ দিচ্ছিলেন। কয়লার ব্যাপারে সরকারের তখন এমন হাত-বাঁধা অবস্থা ছিল যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার অগ্রসর হয়নি।

বার্ট্রান্ড রাসেল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

প্রথম অধ্যায়
রাজনৈতিক আদর্শ ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
পুঁজিবাদ ও মজুরিপ্রথা ৩৮

তৃতীয় অধ্যায়
সমাজতন্ত্রের ত্রুটির দিক ৫২

চতুর্থ অধ্যায়
ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ৬৫

পঞ্চম অধ্যায়
জাতীয় স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ৮১

সংযোজন
নোবেল পুরস্কার গ্রহণকালের বক্তৃতা :
রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি-প্রবৃত্তি ৯৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

রাজনৈতিক আদর্শ

দুর্দিনে মানুষ একটা সুস্পষ্ট বিশ্বাস ও প্রোথিতমূল আশার প্রয়োজন অনুভব করে। এই বিশ্বাস এবং আশাই তখন, মানুষের মনে প্রশান্ত উদ্দীপনার জন্ম দেয়। ফলে যাত্রাপথের বাধা মানুষের নিকট তখন আর বাধারূপে প্রতীয়মান হয় না। যে অবস্থার মধ্য দিয়ে এখন আমরা অগ্রসর হচ্ছি[১] তা আমাদের অনেকেরই বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেসব জিনিসকে আমরা খারাপ বলে ধারণা করতাম, প্রকৃতপক্ষেই সেগুলো খারাপ। আর আমরা আগের চেয়ে অনেক বেশি নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি, একমাত্র কোন্ পথ ধরে চলে বর্তমান ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীর ধ্বংসাবশেষের উপর উন্নততর নতুন পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষের পারস্পরিক রাজনৈতিক আচরণ সম্পূর্ণ ভুল আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত; এবং অনাহার ধ্বংস ও পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শ প্রয়োজন।

রাজনৈতিক আদর্শকে অবশ্যই ব্যক্তিজীবনের আদর্শের ওপর ভিত্তিশীল হতে হবে। ব্যক্তিজীবনকে যতদূর সম্ভব ভালো করে তোলাই হবে রাজনীতির উদ্দেশ্য। পুরুষ, নারী ও শিশুদের নিয়ে গঠিত বিচিত্র এই পৃথিবীর বাইরে রাজনীতিবিদদের চিন্তা করার মতো কিছুই নেই। রাজনীতির কাজ হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এমন অন্বয় প্রতিষ্ঠা করা যাতে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকেই, জীবনে যতদূর ভালো হওয়া সম্ভব, তা হতে পারে। তার জন্য প্রথমে বিচার করে দেখতে হবে ব্যক্তিজীবনের কল্যাণ বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি।

প্রথমেই বলতে হয়, সকল মানুষ এক রকম হয়ে থাকে— এটা আমরা চাই না। আমরা এমন কোনো ছাঁচ বা আদর্শ স্থির করে দিতে চাই না, যাতে সব রকমের মানুষকেই কোনো না কোনো উপায়ে একটা মোটা শ্রেণিতে ফেলা যায়। এ আদর্শ অসহিষ্ণু প্রশাসকেরই হতে পারে। একজন অযোগ্য শিক্ষকই

১. ১৯১৪-১৮ সনের বিশ্বযুদ্ধ

www.pathagar.com

তাঁর মতকে ছাত্রের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবেন, এবং চাইবেন, কোনো বিতর্কমূলক বিষয়ে সকল ছাত্রই একই জবাব লিখুক। শোনা যায়, মিস্টার বার্নার্ড শ' শেক্সপিয়রের নাটকগুলোর মধ্যে *ট্রয়লাস এ্যান্ড ক্রেসিডা*-কেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মত পোষণ করেন। যদিও এ ব্যাপারে আমার মত ভিন্ন তবু কোনো ছাত্রকে এই মত সমর্থন করতে দেখলে তাকে তার স্বাতন্ত্র্যের জন্য স্বাগত জানাব। কিন্তু বেশিরভাগ শিক্ষকই এমন একটা অগতানুগতিক মতকে সহ্য করতে চাইবেন না। শুধু শিক্ষকরাই নন, কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত যে কোনো ব্যক্তিই তাঁর অধস্তনদের কাছে নিছক এক ধাঁচের কাজ চাইবেন— যাতে তাঁর কার্যপরিচালনার সুবিধা হয় এবং কখনো কোনো ব্যতিক্রম না ঘটে। এর ফলে তাঁরা যখনই পারেন নতুন উদ্যম ও বক্তিবৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করে দেন এবং তা না পারলে তা নিয়ে বিবাদে মত্ত হন।

সকল মানুষের জন্য এক আদর্শ নয়, বরং সম্ভব হলে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আলাদা আদর্শকেই সত্য করে তুলতে হবে। ভালো এবং মন্দ উভয়েরই সম্ভাবনা মানুষের মধ্যে নিহিত আছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সবচেয়ে ভালো হয়ে বিকশিত হবার একটি এবং সবচেয়ে খারাপ হয়ে বিকশিত হবার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো মানুষের অন্তঃস্থিত মহৎ শক্তির বিকাশ ঘটবে, না তা ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং তার খারাপ প্রবৃত্তিগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠবে, না ধীরে ধীরে সেগুলো ভালোর দিকে মোড় নেবে, তা তার পরিবেশই স্থির করে।

সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য মানবচরিত্রের কোনো বিশদ আদর্শ যদিও আমরা নির্ধারণ করতে পারি না— যেমন, আমরা বলে দিতে পারি না যে, সব মানুষেরই পরিশ্রমী কিংবা আত্মত্যাগী কিংবা সংগীতপ্রিয় হওয়া উচিত— তথাপি কতকগুলো সাধারণ নীতি আমরা নির্ণয় করতে পারি যেগুলো, কী আমাদের কাম্য এবং কী আমাদের দ্বারা সম্ভব, তা নিরূপণের কাজে আমাদের পথপ্রদর্শকরূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

আমরা দু-রকম শ্রেয় বা সম্পদ এবং সেগুলোর পেছনে দু-রকম তাড়না লক্ষ করতে পারি। এক রকম সম্পদ আছে যার বেলায় ব্যক্তিগত অধিকার সম্ভব এবং আর এক রকম সম্পদ আছে যাতে সকলেই সমভাবে শরিক হতে পারে। একজন লোক যদি কোনো জিনিস খায় বা পরে, তাহলে অন্য কোনো ব্যক্তি তা খেতে বা পরতে পারে না; সরবরাহ যদি অপর্যাপ্ত হয় তাহলে একজনের অধিকারলব্ধ বস্তু অন্যকে বঞ্চিত করে। লব্ধ বস্তুগত সম্পদের বেলায়ই সাধারণভাবে এ ব্যাপারটি ঘটে; এবং সেজন্য বর্তমান পৃথিবীর অর্থনৈতিক জীবনের বৃহত্তর

www.pathagar.com

অংশের বেলায়ই একথা খাটে। পক্ষান্তরে মানসিক বা আত্মিক সম্পদ একজনকে বঞ্চিত করে অপরজনের ভোগ্য হয় না। কেউ যদি কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত হন তাহলে অপর কারো পক্ষে তা জানায় কোনো বাধা নেই, বরং এর ফলে অন্যের পক্ষে সে জ্ঞান লাভ সহজসাধ্য হয়। কেউ যদি বড় শিল্পী বা কবি হন, তাহলে সেজন্য অন্য কারও ছবি আঁকায় বা কবিতা লেখায় কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না; বরং তা এসবের চর্চার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। যদি কেউ মানুষের কল্যাণকামী হন, তাহলে অন্যদের পক্ষে কল্যাণকামনার ক্ষেত্র মোটেই সঙ্কীর্ণ হয় না। যিনি যত বেশি মঙ্গলকামী, তিনি অন্যের মনে তত বেশি মঙ্গলকামনা জাগাতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে 'স্বত্বাধিকার' বলে কিছু নেই, কারণ এসবের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই যা বিভক্ত হতে পারে। এ ব্যাপারে কোথাও কোনো বৃদ্ধি ঘটলে তা সর্বত্র বৃদ্ধি ঘটানোর সহায়ক হয়।

দু-রকম সম্পদের পেছনে দু-রকম তাড়না বর্তমান। এক রকম তাড়না 'অধিকারমূলক'। এর লক্ষ্য হয়, সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে হস্তগত ও সঞ্চয় করার দিকে যাতে অন্য কেউ সে সম্পদের অংশীদার হতে না পারে। সম্পত্তিলিপ্সাকে কেন্দ্র করেই এই তাড়নাসমূহ আবর্তিত। আর এ রকম তাড়না 'সৃজনমূলক' বা গঠনমূলক; এর লক্ষ্য হয় পৃথিবীতে এমন সব সম্পদ সৃষ্টি কিংবা সহজলভ্য করার প্রতি যেগুলোতে কোনো ব্যক্তিগত অধিকার বা মালিকানা থাকে না।

সেই জীবনই শ্রেষ্ঠ যে জীবনে গঠনমূলক ও সৃষ্টিশীল তাড়নার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি এবং মালিকানা বা স্বত্ব লাভের তাড়নার ভূমিকা সবচেয়ে কম। এটা কোনো নতুন আবিষ্কার নয়। যিশুখ্রিস্টের উপদেশাবলিতে আছে : 'কী খাব, অথবা কী পান করব, কিংবা কী পরব— তা ভেবে চিন্তিত হয়ো না।' এসব নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আরো জরুরি বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা হয় না। এর চেয়েও মারাত্মক হল, এসবের চিন্তা থেকে যে মানসিক অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তা নিতান্তই কুৎসিত এবং তা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিদ্বেষ, আধিপত্যলিপ্সা, নিষ্ঠুরতা এবং পৃথিবীকে বিষাক্ত করে তুলে এমন প্রায় সব রকম নৈতিক অনাচার সৃষ্টি করে। মানুষকে তা দস্যুতামূলক বলপ্রয়োগের দিকে ধাবিত করে। বস্তুর স্বত্ব বলপ্রয়োগ করে লাভ করা যায়, এবং লুণ্ঠনকারীরা তা ভোগ করতে পারে। আত্মিক সম্পদের স্বত্ব এভাবে কেড়ে নেয়া যায় না। একজন শিল্পী কিংবা চিন্তাবিদকে আপনি হত্যা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর শিল্পকর্ম বা চিন্তাকে আত্মসাৎ করতে পারেন না। মানুষকে ভালোবাসে বলে কোনো লোককে আপনি হত্যা করতে পারেন, কিন্তু তা দ্বারা সেই লোকটি ভালোবেসে যে আনন্দ পেত,

www.pathagar.com

তা আপনি লাভ করতে পারেন না। এসব ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ একেবারেই অকেজো। কেবল বস্তুগত সম্পদলাভের বেলায়ই বল কার্যকর। এ কারণেই যারা বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী, তাদের চিন্তা ও কামনা পূর্ব থেকেই বস্তুসম্পদের মালিকানা লাভের লিপ্সা দ্বারা আচ্ছন্ন।

স্বত্বাধিকারের তাড়নাসমূহ প্রবল হয়ে উঠলে সেগুলো দ্বারা যেসব ক্রিয়াকলাপের সম্পূর্ণ সৃষ্টিধর্মী হয়ে ওঠার কথা সেগুলোও কলুষিত হয়। যে ব্যক্তি মূল্যবান কিছু আবিষ্কার করেছেন, তাঁরই মন প্রতিদ্বন্দ্বী আবিষ্কারের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠতে পারে। এক ব্যক্তি যদি ক্যানসারের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন এবং অন্য এক ব্যক্তি যদি যক্ষ্মার প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন, তাহলে তাঁদের একজন অন্যজনের আবিষ্কারের কোনো ভুল ধরা পড়লে আনন্দ বোধ করতে পারেন। রুগীদের দুঃখে দুঃখিত হওয়ার পরিবর্তে এই আনন্দ তাঁরা অনুভব করতে পারেন। আবিষ্কৃত ঔষধ যথার্থ হলে রুগীর কষ্টের যে লাঘব হবে, একথা তাঁরা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান লাভের কিংবা প্রয়োজনের জন্য জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে মানুষ তা আকাঙ্ক্ষা করে নিতান্তই খ্যাতি লাভের উপায় হিসেবে। প্রতিটি সৃজনী তাড়নাই এক-একটি স্বত্বাধিকারের তাড়নায় আচ্ছন্ন। এমনকি ঋষিত্বকামী পুরুষও সফলতর ঋষির প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে পারেন। অধিকাংশ অনুরাগের সঙ্গেই কিছু ঈর্ষার রঙ মিশে থাকে। এ হচ্ছে সৃজনী তাড়নার রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী স্বত্বলাভের তাড়না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাপার হল : জীবনে যা কিছু প্রেয় ও লভ্য তার কোনো কিছুই যারা পায়নি এবং যারা সহজাত প্রবৃত্তিবশত নিজেরা যা ভোগ করেনি তা ভোগ করা থেকে অন্যদের বঞ্চিত রাখতে চায়, তাদের নিছক ঈর্ষা। তরুণদের প্রতি প্রবীণদের মনোভাবের মধ্যে এটা প্রায়শ প্রচুর পরিমাণে লক্ষ করা যায়।

উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে যেমন মানুষের মধ্যেও তেমনি একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতিগত বৃদ্ধির বা বিকাশের তাড়না আছে, এবং তা শারীরিক বিকাশের বেলায় যেমন সত্য তেমনি সত্য মানসিক বিকাশের বেলায়ও। বায়ু, পুষ্টিবিধান ও ব্যায়ামের দ্বারা শারীরিক বিকাশের সহায়তা হয়, এবং চীনের মেয়েদের পা যে ব্যবস্থা দ্বারা ছোট রাখা হত সেই ধরনের ব্যবস্থায় তা বাধাগ্রস্ত হয়। ঠিক একইভাবে বাইরের কোনো কিছুর প্রভাবে মানসিক বিকাশেরও সহায়তা হতে পারে কিংবা তা ব্যাহত হতে পারে। যেসব বাহ্য প্রভাব চিত্তবৃত্তির চর্চার জন্য নিছক উৎসাহ বা মানসখাদ্য বা সুযোগ-সুবিধা জোগায় সেগুলোই মানসিক

www.pathagar.com

বিকাশের সহায়ক হয়। আর যে কোনো ধরনের বলপ্রয়োগের দ্বারা যেসব প্রভাব বিকাশের ধারায় হস্তক্ষেপ করে, সেগুলোই হয় অন্তরায়। অন্তরায় সৃষ্টিকারী শক্তির মধ্যে থাকতে পারে নিয়ম-শৃঙ্খলা, কিংবা কর্তৃপক্ষ, কিংবা ভীতি, কিংবা জনমতের চাপ, কিংবা সম্পূর্ণ অমনোপূত পেশায় নিয়োজিত হবার প্রয়োজন। নৈতিকতার জগতে মানুষের মৌলিক তাড়না বিবেক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যেসব শক্তি দ্বারা মানুষের এই মৌলিক তাড়না ব্যাহত কিংবা বিকৃত হয়, সেগুলোর প্রভাবই হয় সবচেয়ে মারাত্মক। এসব প্রভাবের দ্বারা মানুষের এমন অভ্যন্তরীণ ক্ষতি হতে পারে যে, তা কোনো দিনই আর পূরণ হবার নয়।

কারো ওপর যে কোনো রকম শক্তি প্রয়োগের দ্বারা যে ক্ষতি সাধিত হয় তা এবং শক্তি প্রয়োগের দ্বারা অর্জিত সম্পদ যে সম্পূর্ণ মূল্যহীন, এটা যাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন তাঁরা অন্যদের স্বাধীনতার প্রতি অবশ্যই অশেষ শ্রদ্ধাশীল হবেন; তাঁরা অন্যদের বন্ধন ও শৃঙ্খলের মধ্যে রাখতে চাইবেন না; তাঁরা বিচারের বেলায় ধীর কিন্তু সহানুভূতি প্রকাশে দ্রুত হবেন; প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আচরণে তাঁদের এক ধরনের কোমলতা প্রকাশ পাবে, কারণ মানুষের অন্তঃস্থিত শ্রেয়োচেতনা যুগপৎ কোমল ও অপরিসীম মূল্যবান। যাঁরা তাঁদের মতো নন, তাঁদের তাঁরা নিন্দা করবেন না। তাঁরা উপলব্ধি করবেন যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মতপার্থক্যের সৃষ্টি করে, এবং চিন্তার ক্ষেত্রে মতপার্থক্যহীন সুসমতা মানেই মৃত্যু। তাঁদের কামনা হবে : প্রতিটি মানুষ যান্ত্রিক বস্তুতে পরিণত না হয়ে যত বেশি সম্ভব প্রাণবান সত্তা হয়ে উঠুক। নিষ্ঠুর পৃথিবীর নির্দয় ব্যবহারে মানবচিত্তের যেসব বৃত্তি ধ্বংস হয়ে যায়, প্রতিটি মানুষের মধ্যে সেসব বৃত্তির সুস্থতাই তাঁরা কামনা করবেন। অপরের প্রতি ব্যবহারে সর্বদা তাঁদের অন্তরে থাকবে এক গভীর 'মর্যাদাবোধে'র তাগিদ।

ব্যক্তির জন্য আমাদের কাম্য কী, তা এতক্ষণে স্পষ্ট হল। সৃজনী তাড়নার অন্তহীন বিকাশ, স্বত্বলিপ্সা বা মালিকানা লাভের সহজাত প্রবৃদ্ধির দমন, অন্যের প্রতি মর্যাদাবোধ, আর নিজেদের অন্তঃস্থিত মৌলিক সৃজনী তাড়নার প্রতি শ্রদ্ধা— এসবই ব্যক্তির বেলায় আমাদের কাম্য। এক ধরনের আত্মমর্যাদাবোধ অথবা সহজাত অহংবোধ উন্নত জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন। একজন মানুষকে যদি পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বাঁচতে হয় তাহলে অবশ্যই মানসিক দিক দিয়ে তার সম্পূর্ণ পরাজয়ের মনোভাব থাকলে চলবে না; বাইরে থেকে কিংবা ভেতর থেকে সে যতই বাধার সম্মুখীন হোক, তার মধ্যে উৎকৃষ্ট যা কিছু আছে তাই নিয়ে তাকে সাহস, আশা ও সঙ্কল্পের জীবন যাপন করতে হবে। স্বত্বলিপ্সা

www.pathagar.com

বা মালিকানা লাভের তাড়না নয়— সৃজনী তাড়না, অন্যের প্রতি মর্যাদাবোধ এবং নিজের মধ্যকার মহৎ মৌলিক বৃত্তিসমূহের প্রতি বিশ্বস্ততা— এই তিনটি জিনিস যাঁর মধ্যে থাকবে তিনি নিজের জীবনের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাসমূহকে বাস্তবায়িত করতে পারবেন।

রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তির কী মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটায়, তা দ্বারাই সেগুলোর মূল্য বিচার করতে হবে। সেগুলো কি সৃজনস্পৃহাকে স্বত্বলিপ্সা থেকে অধিক উৎসাহ দেয়? সেগুলো কি মানুষে শ্রদ্ধার মনোভাবের ব্যাপ্তি ঘটায়? সেগুলো কি আত্মমর্যাদাবোধকে রক্ষা করে?

এসব দিক থেকে বিচার করলে যেসব প্রতিষ্ঠানের অধীনে আমরা জীবন ধারণ করি সেগুলো প্রকৃতপক্ষে যেমন হওয়া উচিত তা থেকে অনেক দূর।

প্রতিষ্ঠানসমূহ, এবং বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ, নর-নারীর চরিত্র গঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এগুলোর প্রভাবে জীবনে সাহস ও আশার সৃষ্টি হতে পারে, আবার ভীরুতা ও আত্মরক্ষার মনোভাবও গড়ে উঠতে পারে। এগুলো মানুষের মনকে বিপুল সম্ভাবনার দিকে উন্মুক্ত করে দিতে পারে, আবার সেই মনকে সব দিক দিয়ে গুটিয়ে দিয়ে একমাত্র দুর্ভাগ্যের কালো আঁধারের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এগুলোর প্রভাবে মানুষের সুখ নির্ভর করতে পারে— সে বিশ্বের সাধারণ সম্পদে কী যোগ করছে তার ওপর; কিংবা যে সম্পদে অন্য কেউ অংশীদার হতে পারে না সেই ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা সে নিজের জন্য কতখানি আয়ত্ত করতে পারছে তার ওপর। আধুনিক পুঁজিবাদ একমাত্র নায়কোচিত ও অসাধারণ ভাগ্যবান ব্যক্তিদের ছাড়া আর সকলের ওপর এই দুই বিকল্পের ভুল সিদ্ধান্তটিই চাপিয়ে দেয়।

মানুষের তাড়নাসমূহ আংশিকভাবে সহজাত প্রবণতা দ্বারা এবং আংশিকভাবে সুযোগ ও পরিবেশ দ্বারা, বিশেষ করে প্রথম জীবনের পরিবেশ দ্বারা, গঠিত হয়। প্রচারকার্যের দ্বারা মানুষের তাড়নাসমূহের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। তবে তা দ্বারা জনসাধারণের তাড়নাসমূহের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তিকে দমন করা যায়। কিন্তু তার ফল এই হয় যে, তাড়নাসমূহ গোপন পথে বিকশিত হয়ে বিকৃত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আমরা যখন জানতে পেরেছি কোন ধরনের তাড়না আমাদের কাম্য, তখন তার জন্য শুধু প্রচার চালিয়ে, কিংবা গভীর উৎস সৃষ্টি না করে কেবল তার বাহ্য অভিব্যক্তি ঘটাবার চেষ্টা করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। আমাদের অবশ্যকর্তব্য হল, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাসমূহের এমন পরিবর্তন ঘটানোর জন্য চেষ্টা করা যাতে

www.pathagar.com

সেই পরিবর্তিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাসমূহ স্বতঃই মানবচিত্তের বৃত্তিসমূহকে অভীষ্ট পথে পরিচালিত করে।

বর্তমানে আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ দাঁড়িয়ে আছে সম্পত্তি ও ক্ষমতা, এই দুটি জিনিসের ওপর। এ দুটির উভয়টিরই বণ্টন অত্যন্ত অন্যায়ভাবে হয়েছে; অথচ বাস্তব জগতে ব্যক্তির সুখের জন্য দুয়েরই গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। দুটোই স্বত্বাধিকারের বিষয়; তবু বর্তমান অবস্থা যেমন তাতে এগুলো ছাড়া সকলে অংশীদার হতে পারে তেমন অনেক জিনিসই অর্জন করা দুঃসাধ্য।

বর্তমান অবস্থায় সম্পত্তি ছাড়া কারো কোনো স্বাধীনতা বা সহনীয় জীবন যাপনের নিরাপত্তা নেই, এবং ক্ষমতা ছাড়া কারও উদ্যোগ গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। সৃজনী তাড়নাসমূহের স্বাধীন অনুশীলনের জন্য মানুষকে অবশ্যই দুশ্চিন্তার তুচ্ছতা থেকে মুক্ত থাকার নির্দিষ্ট পরিমাণ নিশ্চয়তার অধিকারী হতে হবে এবং ক্ষমতায়ও অবশ্যই তার উপযুক্ত অংশ থাকতে হবে— যাতে জীবনের চলার পথ ও অবস্থা নির্ণয়ে সে নতুন উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ পায়।

পুরোপুরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই জগতে খুব কম লোকই স্বত্বলিপ্সু না হয়ে সৃজনাকাঙ্ক্ষী হতে পারে; কারণ এ এমন এক জগৎ যেখানে বস্তুগত সম্পদ অর্জনে অমনোযোগী হলে বিরাট সংখ্যাগুরু মানুষ চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়, যেখানে জ্ঞানের চেয়ে অর্থকেই বেশি সম্মান ক্ষমতা ও মূল্য দেয়া হয়— যেখানে সম্পত্তিহীনের প্রতি সম্পত্তিশালীর অবিচারকে আইন দিয়ে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এমন পরিবেশে এমনকি প্রকৃতি যাঁদের বিরাট সৃজনপ্রতিভা দান করেছে তাঁরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষে জর্জরিত হন। বস্তুগত সম্পদ লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধিকতর শক্তি অর্জনের জন্য মানুষ দলবদ্ধ হয়, এবং দলের প্রতি যে আনুগত্য তাতে অন্তঃসারশূন্য আদর্শের মায়াজালের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে লোভের তাড়না। ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও শ্রমিক দল যদিও একটা সম্পূর্ণ নতুন উন্নততর পৃথিবী সৃষ্টির আশায় বহুলাংশে অনুপ্রাণিত, তথাপি তারাও অন্যান্য দল ও সামাজিক গোষ্ঠীর চেয়ে এই ত্রুটি থেকে মোটেই বেশি মুক্ত নয়। নিজেদের জন্য অধিকতর বস্তুগত সম্পদ লাভের সাময়িক লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে তাঁরাও প্রায়শ বিপথগামী হন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা যে ন্যায়ানুগ তা অস্বীকার করার উপায় নেই; কিন্তু আগামীকালের বিজয়ীদের পরশু দিনই যদি অত্যাচারী হয়ে উঠতে না হয়, তাহলে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে দরকার আরো মহৎ ও গঠনমূলক কিছু। সংস্কার-আন্দোলনের প্রেরণা ও পরিণতি হওয়া উচিত স্বাধীনতা ও উদার মনোভাব— বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুনের তুচ্ছ খুঁটিনাটি নয়।

www.pathagar.com

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বল্পসংখ্যক বিরাট ধনীর হাতেই নতুন কিছু করার সুযোগ কেন্দ্রীভূত রেখেছে। যাঁরা পুঁজিপতি নন তাঁরা যদি একবার কোনো ব্যবসা বা পেশা বেছে নেন, তাহলে নিজেদের কাজকর্মের ওপর প্রায় কোনো সময়ই আর তাঁদের স্বাধীন ইচ্ছার বা পছন্দ-অপছন্দের কোনো সুযোগ থাকে না; তখন তাঁরা পরিচালিত হতে থাকেন যন্ত্রের নিষ্ক্রিয় অংশরূপে— যন্ত্র পরিচালনায় কোনো ভূমিকা তখন আর তাঁদের থাকে না। রাজনৈতিক গণতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও একজন পুঁজিপতি ও একজন জীবিকার-দুশ্চিন্তায়-ব্যস্ত মানুষের মধ্যে আত্মপরিচালনার ক্ষমতায় অসাধারণ ব্যবধান বিদ্যমান। রাজনৈতিক প্রশ্নের চেয়ে অর্থনৈতিক বিষয় প্রায় সকল সময়েই মানুষের জীবনকে অনেক বেশি গভীরভাবে স্পর্শ করে। বর্তমানে, যাঁর নিজের পুঁজি নেই সাধারণত তাঁকে কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কাছে— যেমন কোনো শিল্পকোম্পানির কাছে, আত্মবিক্রয় করতে হয়। যে প্রতিষ্ঠানে তিনি জীবিকার জন্য কাজ করেন তার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মতামত প্রকাশের কোনো অধিকার তাঁর থাকে না, এবং একমাত্র তাঁর ট্রেড ইউনিয়ন তাঁর জন্য যা আদায় করে দিতে পারে তার বাইরে রাজনীতিতেও তাঁর কোনো স্বাধীনতা থাকে না। তাঁর মনে যদি এমন কোনো স্বাধীনতার কামনা থাকে যা তাঁর ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না, তাহলে তিনি অসহায় : হয় তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হয়, নাহয় করতে হয় উপবাস।

পেশায় নিযুক্ত মানুষের বেলায়ও একই ব্যাপার ঘটে। বেশিরভাগ সাংবাদিকই এমনসব সংবাদপত্রের জন্য লেখায় নিয়োজিত, যাদের রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের মতের কোনো মিল নেই। একমাত্র কোনো ধনবান লোকের পক্ষেই বিরাট সংবাদপত্রের মালিক হওয়া সম্ভব, আর যাঁরা বিত্তবান নন তাঁদের মতামত অথবা স্বার্থের বিষয় নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা রূপেই কোনো পত্রিকায় স্থান লাভ করতে পারে। দেশের উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত। এই চাকরিতে তাঁদের নিয়োগের শর্ত হল— তাঁদের কাছ থেকে যেসব অন্যায় গোপন রাখা সম্ভব হয় না সেগুলো সম্পর্কে তাঁদের নির্বাক থাকতে হবে। স্বাধীনচেতা কোনো মন্ত্রীর মতামত তাঁর দলের লোকদের অসন্তুষ্টির কারণ হলে তিনি জীবিকা হারান। পার্লামেন্টের কোনো সদস্য জনমতের প্রতিটি ও চড়াই-উতরাইয়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার মতো যথেষ্ট বশংবদ ও নির্বাক হতে না পারলে আসন হারান। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যতই বৃহত্তর ও সুদৃঢ় হচ্ছে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মনের স্বাধীনতা ততই

www.pathagar.com

পরাজয়ের গ্লানিতে অভিশপ্ত হচ্ছে। মানুষ যে দিন দিন অধিক থেকে অধিকতর বশ্যতাপরায়ণ হয়ে পড়ছে, স্বেচ্ছাতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য আরো বেশি প্রস্তুত হচ্ছে এবং নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার অধিকার জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? এই পথ ধরে চললে সভ্যতা একমাত্র ইতিহাসে বর্ণিত বাইজেন্টাইনের সেই স্থবির অবস্থানে গিয়েই নিমজ্জিত হতে পারে।

উপবাসের ভয় অবশ্যই স্বাধীন সৃজনশীল জীবন গড়ে উঠতে দেয় না। তবু প্রায় সকল মজুরিজীবীরই জীবনের এটাই হচ্ছে প্রধান তাড়না। এর সঙ্গে সম্পর্কিত ধনীদের জীবনের চালিকাশক্তি হচ্ছে, অন্য যে কোনো লোকের চেয়ে অধিক সম্পত্তির ও ক্ষমতার মালিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এরও ফল একই রকম খারাপ। এই তাড়না মানুষকে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে নিজের মনের দ্বার রুদ্ধ করতে বাধ্য করে এবং সামাজিক সমস্যাবলি সম্পর্কে সততার সঙ্গে চিন্তা করা থেকে বিরত রাখে, অথচ সে অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে হৃদয়ের গভীরে অনুভব করে যে, তার আরাম-আয়েশ অন্যের দুর্দশার বিনিময়ে প্রাপ্ত। দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যের অন্যায়কে সমভাবে অসম্ভব করে তুলতে হবে। তা করতে পারলে অনেক লোকের জীবন থেকে একটা বিরাট ভয় দূর হবে এবং কিছু লোকের জীবনের হীন আকাঙ্ক্ষা মহৎ রূপ নেবে।

কিন্তু নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা হল উত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতিবাচক বা নেগেটিভ শর্তমাত্র। এই শর্তসমূহ পূরণ হলে আমাদের দরকার হয় ইতিবাচক বা পজিটিভ শর্তপূরণ— তা হল সৃষ্টশক্তিকে উৎসাহিত করা। নিরাপত্তা এককভাবে শুধু একটা ফিটফাট অন্তঃসারশূন্য স্থবির সমাজের জন্ম দিতে পারে। জীবনের দুঃসাহসিক অভিযান ও কৌতূহলকে সজীব রাখার জন্য এবং ক্রমাগত নতুন ও মহত্তর বিষয়সমূহের দিকে এগিয়ে চলার জন্য নিরাপত্তার সমান্তরালে প্রয়োজন সৃজনশীলতার। মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো শেষ লক্ষ্য থাকতে পারে না; সেইসব প্রতিষ্ঠানই সর্বোত্তম যেগুলো আরো উন্নত প্রতিষ্ঠানে বিকশিত ও রূপান্তরিত হওয়াকে সর্বাধিক উৎসাহিত করে। উন্নতির প্রয়াস ও অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া মানবজীবন ভালো থাকতে পারে না। কোনো গতিহীন চূড়ান্ত কল্পস্বর্গ আমাদের কাম্য হওয়া উচিত নয়, আমাদের কাম্য হওয়া উচিত এমন এক পৃথিবী যেখানে কল্পনা ও আশা সর্বদা সজীব, সক্রিয় ও বিকাশশীল।

মানবজাতি যে অতিরিক্ত শারীরিক শ্রমজনিত ক্লান্তিতে ভুগেছে, তারই এক করুণ প্রমাণ হল, মানুষের স্বর্গ, বেহেশত ইত্যাদি এমন সব জায়গা যেখানে

www.pathagar.com

কিছুই কখনো ঘটে না কিংবা যেখানকার কোনো কিছুই কখনো পরিবর্তিত হয় না। অত্যধিক শ্রমের ফলেই এই ভ্রম সৃষ্টি হয় যে, সুখের জন্য কেবল বিশ্রামই দরকার। কিন্তু যখন মানুষ কিছুকালের জন্য বিশ্রাম ভোগ করে তখন একঘেয়েমিজনিত বিরক্তি তাকে নতুনতর কাজের দিকে তাড়িত করে। এজন্য সুখী জীবন অবশ্যই কর্মময় জীবন। এই জীবনকে যদি মূল্যবানও হতে হয় তাহলে কর্মকে হতে হবে যতদূর সম্ভব সৃজনশীল— বলদর্পী কিংবা আত্মরক্ষামূলক নয়। কিন্তু সৃষ্টিশীল কর্মের জন্য প্রয়োজন এমন কল্পনা ও মৌলিকতা যা প্রয়োজনে 'প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানাদি'র বিরুদ্ধে প্রয়োজনে বিধ্বংসী ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম। বর্তমানে যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে তারা তাদের অন্যায় সুযোগ-সুবিধা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে— এই ধারণাবশে 'প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানাদি'র যে কোনো রকম পরিবর্তনকেই ভীষণ ভয় পায়। যূথবদ্ধভাবে বসবাসকারী অন্যান্য প্রাণীর মতোই মানুষেরও গতানুগতিক অনুসরণ করে চলার যে সহজাত প্রবণতা রয়েছে তার সুযোগ গ্রহণ করে, প্রচলিত ব্যবস্থা দ্বারা যারা লাভবান হয় তারা এমন এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যা মানুষের প্রথম স্কুলে যাওয়ার মুহূর্তটি থেকে কবরে যাওয়ার মুহূর্তটি পর্যন্ত তার মৌলিকতাকে নিষ্পেষিত করে ও কল্পনাকে উপবাসী রাখে। শিশুরা যাতে বিচার-বিবেচনা ছাড়া নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্যের চিন্তা ও অনুভূতিকে মেনে নেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করে নিজেদের চিন্তা ও অনুভব নিজেরাই করতে উৎসাহিত হয়, সেজন্য শিক্ষা যে মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, সমগ্রভাবে তার পরিবর্তন দরকার। সাফল্যের জন্য পুরস্কার নয়, বরং একটা বিশেষ মানসিক পরিবেশই নতুন উদ্যোগের জন্ম দেবে। অতীতে কোনো কোনো সময় তেমন পরিবেশের অস্তিত্ব ছিল। উদাহরণ স্বরূপ গ্রিসের গৌরবময় দিনগুলোর এবং এলিজাবেথীয় ইংল্যান্ডের কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু আমাদের এই কালে বৃহদায়তন যন্ত্র সদৃশ বিরাট সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ উপর থেকে এমনসব লোক দ্বারা পরিচালিত হয় যাঁরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন লোকদের জীবন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না এবং কোনো প্রকার দায়িত্বও বোধ করেন না। এসব প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাচার-স্বৈরাচারের ফলে মানুষের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও মনের স্বাধীনতার মৃত্যু ঘটছে। মানুষকে তাঁরা একই ছাঁচে এক রকম করে গড়ে তোলার জন্য ক্রমাগত অধিক থেকে অধিকতর চাপ ও বল প্রয়োগ করে চলছে।

বিরাট সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান আধুনিক জীবনধারার অপরিহার্য অবলম্বন। উইলিয়ম মরিস প্রমুখ সংস্কারকগণ যে এগুলোর বিলুপ্তির কথা বলেছেন, সে

www.pathagar.com

লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে কোনো লাভ হবে না। এসব প্রতিষ্ঠান যে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উপায়কে দুরূহ করে তোলে, তা সত্য; প্রয়োজন ব্যক্তিগত উদ্যোগের সম্ভাব্য সর্বাধিক সুযোগের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্বয় সাধনের উপায় বের করা।

এই লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতিকে গণতান্ত্রিক করা। বর্তমানে আমাদের আইন-প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মোটামুটি গণতান্ত্রিক, শুধু একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হল, মেয়েরা এর থেকে বাদ পড়েছে।[১] কিন্তু আমাদের প্রশাসন এখনো সম্পূর্ণই আমলাতান্ত্রিক, এবং আমাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজতান্ত্রিক পদ্ধতির, কিংবা নির্দিষ্ট শ্রেণির স্বল্পসংখ্যক লোকের নিয়ন্ত্রণাধীন। অংশীদারদের সীমাবদ্ধ দায়িত্বের প্রতিটি কোম্পানি পরিচালিত হয় স্বনিয়োজিত কিংবা পূর্ববর্তীদের দ্বারা মনোনীত স্বল্পসংখ্যক পরিচালক দ্বারা। কোনো ব্যবসায়ে বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যে লোকেরা কাজ করে, তারাও যতদিন পর্যন্ত তার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ না করে, ততদিন পর্যন্ত কোনো প্রকৃত স্বাধীনতা বা প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভব নয়।

আরও একটি ব্যবস্থা স্বাধীনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। তা হল, অধস্তন গোষ্ঠীসমূহের স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধি করা। অধস্তন গোষ্ঠীর মধ্যে ভৌগোলিক বা নৃতাত্ত্বিক বা অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতো কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের বা বিশ্বাসের কোনো জনসমষ্টি থাকতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্র এত বিশাল এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ে সাধারণের জ্ঞান এত সামান্য যে, একজন মানুষ ভোটাধিকার লাভ করেও নিজেকে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক শক্তির কোনো কার্যকর অংশ বলে অনুভব করে না। যেসব ক্ষেত্রে সে কোনো ক্ষমতাসম্পন্ন দলের সঙ্গে মিলে কাজ করতে পারে, একমাত্র সেগুলো ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে সে নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় অনুভব করে; আর সরকার একটা অত্যন্ত দূরবর্তী নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার রূপে বিরাজ করে— যাকে তার অবশ্যই আবহাওয়ার মতো সহ্য করতে হয়। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করে মানুষ প্রাচীন গ্রিস অথবা মধ্যযুগের ইতালির নগররাষ্ট্রসমূহের নাগরিকদের ব্যক্তিগত সুযোগ ও দায়িত্বের বোধ আবার কিছুটা অনুভব করতে পারে।

যখন কোনো জনসমষ্টির মধ্যে দৃঢ় সংহতিবোধ থাকে— যেমন কোনো জাতি বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়— তখন স্বাধীনতার দাবি হল, যেসব বিষয় বাইরের জগতের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় সে সব

১. মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পার্লামেন্টের দুটো আইন লেগেছে : ১৯১৮ সনে ত্রিশ বছর বয়সের মেয়েরা এবং ১৯২৮ সনে একুশ বছরের নারী-পুরুষ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ অধিকার। এটাই হচ্ছে জাতীয় স্বাধীনতার বিশ্বজনীন দাবির ভিত্তি। কিন্তু কেবল জাতিসমূহই আভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি সম্পর্কে স্বায়ত্তশাসন লাভের অধিকারী, অন্য কোনো জনসমষ্টি নয়— একথা ঠিক নয়। আর অন্যান্য জনসমষ্টির মতো একটি জাতিও, যেসব ব্যাপারে অন্যান্য জাতির নিকটও সমান গুরুত্বপূর্ণ সেসব ব্যাপারে, কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে পারে না। স্বাধীনতার দাবি স্বশাসন, অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার নয়। অরাজকতার দ্বারা সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা লাভ করা যায়— একথা ঠিক নয়। শাসনের সঙ্গে স্বাধীনতার মিলন ঘটানো দুরূহ সমস্যা। কিন্তু যে কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বকেই এ সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে হবে।

শাসনের মূল বিষয় হচ্ছে, আইনসম্মত উপায়ে শক্তি প্রয়োগ করে এমন কতকগুলো লক্ষ্য অর্জন করা যেগুলোকে ক্ষমতাসীনরা প্রয়োজনীয় মনে করেন। শক্তিদ্বারা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দমন করার ব্যাপারটা সব সময়ই অল্প-বিস্তর ক্ষতিকর। কিন্তু যদি সরকারের অস্তিত্ব না থাকত তাহলে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে কোনো রকম বল প্রয়োগের অস্তিত্ব থাকত না— একথা সত্য নয়। বরং তার ফলে যাদের মধ্যে প্রবল লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি রয়েছে তারা বল প্রয়োগ করত। তাতে যাদের প্রবৃত্তি কম আক্রমণাত্মক তাদেরকে হয় দাসত্ব গ্রহণ করতে হত, না হয় শক্তিকে শক্তি দ্বারা প্রতিহত করার চিরপ্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হত। কোনো আন্তর্জাতিক সরকার না থাকার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমানে এ অবস্থাই চলছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে অরাজক অবস্থা বিদ্যমান তার ফলাফলই আমাদের মধ্যে এ উপলব্ধি জাগার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত যে, অরাজকতা দ্বারা পৃথিবীর অন্যায়সমূহের সমাধান সম্ভব নয়।

সরকার কর্তৃক শক্তি ব্যবহারের সম্ভবত মাত্র একটিই প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য রয়েছে। সে উদ্দেশ্য হল পৃথিবীতে মোট যত শক্তিপ্রয়োগ ঘটে তার পরিমাণকে কমিয়ে দেওয়া। উদাহরণ স্বরূপ, এটা খুব স্পষ্ট যে, নরহত্যা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হবার ফলে পৃথিবীতে মোট বলপ্রয়োগের পরিমাণ কমেছে। আর একথা কেউই বলবেন না যে, শিশুদের প্রতি পিতামাতার দুর্ব্যবহার করার সীমাহীন স্বাধীনতা থাকা উচিত। যতদিন কিছু লোকের মনে অন্যের ওপর বলপ্রয়োগের ইচ্ছা বর্তমান, ততদিন পর্যন্ত পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভব নয়; কারণ তাতে হয় বলপ্রয়োগের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নাহয় যারা শক্তির শিকারে পরিণত হয় তাদেরকে দুর্ভোগের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। এই কারণে যদিও নিজেদের ব্যাপারে ব্যক্তি ও সমাজের চূড়ান্ত স্বাধীনতা থাকা উচিত তবু অন্যের সঙ্গে

www.pathagar.com

সম্পর্কের বেলায় তাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়। প্রবলকে দুর্বলের ওপর অত্যাচার চালাবার স্বাধীনতা দান— এ পৃথিবীতে সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ স্বাধীনতা লাভের উপায় নয়। 'অবাধ বাণিজ্য' নীতির সমর্থক অর্থনীতিবিদরা যে ধরনের স্বাধীনতার পক্ষে ওকালতি করে থাকেন, তার বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিদ্রোহের এটাই হচ্ছে ভিত্তি।

গণতন্ত্রই হচ্ছে স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ যথাসম্ভব হ্রাস করার আজ অবধি আবিষ্কৃত সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। যদি কোনো জাতি এমন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে যে, তাদের উভয়টাই ইচ্ছামতো কাজ করার সুযোগ না পায়, তাহলে গণতন্ত্র তত্ত্বগতভাবে এই নিশ্চয়তা দান করে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগই সে সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু গণতন্ত্রের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পৃক্ত না থাকলে তা আদৌ কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা নয়। সকলকে একই ছাঁচের করে তোলার প্রবণতা, অথবা অনধিকার হস্তক্ষেপের তুচ্ছ আনন্দ, কিংবা রুচি ও মেজাজের বিভিন্নতার প্রতি বিরক্তি, প্রায়শ সংখ্যাগরিষ্ঠদেরকে সংখ্যালঘিষ্ঠদের এমন সব ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে চালিত করতে পারে, যেগুলো আদৌ তাদের নিয়ন্ত্রণের বিষয় নয়। কোনো সময় যদি কোনো বিশ্বপরিষদ গঠিত হয়, তাহলে তার দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের মীমাংসা হবে, এটা আমরা কেউই চাইব না। তথাপি এমন অনেক ব্যাপারই রয়েছে, যাদের মীমাংসা বর্তমান সরকারের কোনো অঙ্গের চেয়ে উক্ত বিশ্বপরিষদের মতো প্রতিষ্ঠান অনেক ভালোভাবে করতে পারবে।

যেখানে সরকার বর্তমান, সেখানে মানবীয় বিষয়াবলিতে শক্তির বৈধ প্রয়োগের নীতি, মনে হয়, স্পষ্ট। যারা অন্যের ওপর বলপ্রয়োগের চেষ্টা করে, অথবা সাধারণ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য এমন কোনো ক্ষেত্রে যারা আইন অমান্য করে এবং যেখানে স্বল্পসংখ্যক লোক সংখ্যাগুরুর কাজে ব্যাঘাত ঘটায়, একমাত্র সেইসব ক্ষেত্রেই বলপ্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। এগুলোকেই বলপ্রয়োগের বৈধ ক্ষেত্র বলে মনে হয়, এবং কোনো আন্তর্জাতিক সরকার গঠিত হলে আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও এগুলোই হবে সে ক্ষেত্র। যদি সরকারের অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে বলপ্রয়োগের বৈধ ক্ষেত্র কী হবে, তা ভিন্নতর সমস্যা— সে কথা এখন আমরা ভাবছি না।

যদিও সরকারের বলপ্রয়োগের ক্ষমতা অবশ্যই থাকা উচিত এবং কখনো কখনো বৈধভাবে এই ক্ষমতা প্রয়োগের স্বাধীনতাও থাকা উচিত, তথাপি সংস্কারকদের লক্ষ্য হবে এমন সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেগুলো প্রকৃত

www.pathagar.com

বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হ্রাস করে দেবে এবং এর ফল লাভ নিশ্চিত করবে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা যে চুরি করা থেকে বিরত থাকি তার কারণ এই নয় যে, চুরি করা বেআইনি, বরং চুরি করার কোনো ইচ্ছা মনে জাগে না বলেই আমরা চুরি করি না। মানুষ যতই স্বত্বাধিকারলিপ্সা বর্জন করে সৃজনস্পৃহায় চালিত হয়ে জীবনযাপন করতে শেখে, ততই অন্যের কাজে ব্যাঘাত ঘটাবার ইচ্ছা এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা তার কমে আসে। ব্যক্তি অথবা সংগঠনের পারস্পরিক স্বার্থের যেসব বিষয় নিয়ে কলহের সৃষ্টি হয়, তাদের বেশিরভাগই হল সম্পূর্ণ অবাস্তব। সেসব সম্পদের সকলেই অংশীদার হতে পারে সেগুলোর প্রতি মানুষের দৃষ্টি যত প্রসারিত হবে, এবং যেসব ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করে সেগুলোর প্রতি মানুষের আগ্রহ যত কমবে, ততই ওইসব কলহ আরো অসম্ভব হয়ে উঠবে। জীবনযাপন যে অনুপাতে মানুষ সৃজনস্পৃহার দ্বারা পরিচালিত হবে, সেই অনুপাতে বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ইচ্ছা তার কমে আসবে। সৃষ্টিশক্তির মুক্তি ঘটলে যে অসংখ্য ব্যাপারে সাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ এখন অপরিহার্য বলে চিন্তা করা হয়, সেগুলোর অধিকাংশকেই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার বলে ছেড়ে দেয়া যাবে। এক সময় এমনও চিন্তা করা হত যে, দেশের সকল অধিবাসীর এক ধর্মাবলম্বী হওয়া একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এটা মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। তেমনি সহজাত বৃত্তিসমূহ যতই সহনশীল হয়ে উঠবে ততই দেখা যাবে, যেসব সমরূপতার জন্য এখন এত জোর দেওয়া হচ্ছে সেগুলো অপ্রয়োজনীয়— এমনকি ক্ষতিকর।

মহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান শক্তিপ্রয়োগের ও আধিপত্যের প্রবৃত্তিকে দুই উপায়ে দুর্বল করে দেবে : প্রথমত, সৃজনস্পৃহার অনুশীলনের সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং এই স্পৃহার বিকাশের অনুকূলে শিক্ষাব্যবস্থার নবায়ন ঘটিয়ে; দ্বিতীয়, স্বত্বাধিকারলিপ্সা প্রকাশের বাস্তব সুযোগগুলোকে বিলুপ্ত করে দিয়ে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মচারী ও পরিচালকদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না রেখে যদি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয়ক্ষেত্রেই তার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো যায়, তাহলে তাতে আদেশদানের অভ্যাস রপ্ত করার সুযোগ অনেকখানি কমে যাবে। এই সুযোগের ফলেই নিষ্ঠুরভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের বাসনা জাগে। জেলাসমূহ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ উভয়ের বেলায়ই স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হলে এমন সমস্যা খুব কমই থাকবে যেগুলোতে কোনো ক্ষুদ্রতর জনসমষ্টির স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সরকারের ডাক পড়বে। আর পুঁজিবাদ ও মজুরি প্রথার অবসান ঘটলে এই

www.pathagar.com

ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত যেসব উৎকণ্ঠা ভয় ও লোভ সকল স্বাধীন জীবনকেই রুদ্ধশ্বাস ও আড়ষ্ট করে রেখেছে সেগুলোর প্রধান উদ্দীপক দূর হবে।

মনে হয়, খুব কম লোকেই বুঝতে পারে যে, যেসব অন্যায়ের পীড়ন আমরা সহ্য করি তার অনেকগুলোই সহ্য করা অপরিহার্য নয় এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই সেগুলোর অবসান ঘটানো সম্ভব। যদি আমরা প্রত্যেক সভ্য দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মনেপ্রাণে কামনা করি, তাহলে মাত্র বিশ বছরের মধ্যেই সব রকম শোচনীয় দারিদ্র্য, পৃথিবীর অন্তত অর্ধেক রোগ-শোক এবং যে অর্থনৈতিক দাসত্ব পৃথিবীর দশ ভাগের নয় ভাগ লোককে গ্রাস করে রেখেছে তার অবসান ঘটাতে পারি, পৃথিবীকে আমরা সৌন্দর্য ও আনন্দে ভরে তুলতে পারি, বিশ্বে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি। মানুষ উদাসীন, মানুষের কল্পনা অলস, এবং মানুষ মনে করে যা হয়ে আসছে ভবিষ্যতেও অবশ্যই তাই হয়ে চলবে। একমাত্র এই কারণেই মানুষ এসব অর্জন করতে পারে না। শুভ ইচ্ছা, উদার মনোভাব ও প্রখর বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করলে এসবের বাস্তবায়ন সম্ভব।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুঁজিবাদ ও মজুরিপ্রথা

পৃথিবীটা এমন অনেক অন্যায়ে পূর্ণ যেগুলো প্রতিরোধসাধ্য এবং যেগুলোর প্রতিরোধ ঘটতে দেখলে প্রায় সকলেই আনন্দিত হবে। তথাপি এসব অন্যায় প্রতিষ্ঠিতই থাকছে, এবং এগুলোর উচ্ছেদের জন্য কার্যকর কিছুই করা হচ্ছে না।

এই আপাতবিরোধী ঘটনা অনভিজ্ঞ সংস্কারকদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে, আর মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তন সাধনের দুরূহতা সম্পর্কে যাঁরা অবহিত তাঁদের মোহমুক্তি ঘটাচ্ছে।

প্রত্যেক সভ্য দেশের প্রায় সকল লোকেই যুদ্ধকে অন্যায় বলে স্বীকার করেন; কিন্তু এ স্বীকৃতি যুদ্ধকে দমন রাখছে না।

যারা সম্পদশালী নয়, মোট জনসংখ্যার দশভাগের সেই নয় ভাগের কাছে সম্পদের অন্যায় বণ্টন নিশ্চয়ই এক সুস্পষ্ট অবিচার। তথাপি সে অবিচার অবাধেই চলছে।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের অত্যাচার বিপুলসংখ্যক মানুষের অহেতুক দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। তবু ক্ষমতা অল্প লোকের হাতেই সীমাবদ্ধ এবং তার ঝোঁক আরো বেশি কেন্দ্রীকরণের দিকে।

আমি প্রথমে আমাদের বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যায়সমূহ এবং অতীতের সংস্কারকদের এত কম সাফল্যের কারণসমূহ পর্যালোচনা করব, এবং তারপর অদূর ভবিষ্যতে আরো দীর্ঘস্থায়ী ও স্থায়ী সাফল্য আশা করার কারণসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করব।

যাঁরা উন্নততর পৃথিবীর অভিলাষী, তাঁদের সকলের কাছেই যুদ্ধ[১] একটি চ্যালেঞ্জরূপে দেখা দিয়েছে। যে ব্যবস্থা মানবজাতিকে এমন একটা নৃশংস দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে পারেনি, তাতে কোথাও না কোথাও ত্রুটি রয়েছে,

১. ১৯১৪-১৮ সনের বিশ্বযুদ্ধ

www.pathagar.com

এবং ভবিষ্যতের বিরাট যুদ্ধের সম্ভাবনাকে একেবারে দমিয়ে দিতে না পারলে সে ত্রুটির কোনো স্থায়ী সংশোধন সম্ভব হবে না।

কিন্তু যুদ্ধ হচ্ছে বিষবৃক্ষের শেষ ফল মাত্র। এমনকি শান্তির সময়েও প্রায় সকল মানুষ একঘেয়ে খাটুনির জীবনযাপন করে, প্রায় সব স্ত্রীলোক শ্রমের এমন কঠোর দণ্ড ভোগ করে যে যৌবন উত্তরণের আগেই তাদের জীবনে সুখের সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটে, প্রায় সকল শিশু যে অবস্থার মধ্য দিয়ে বড় হয়, তাতে তাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশের জন্য যেসব জিনিস অপরিহার্য সেগুলো থেকে তারা বঞ্চিতই থেকে যায়। আর যে স্বল্পসংখ্যক লোক অধিক সৌভাগ্যের অধিকারী, তারা অন্যায় সুযোগ-সুবিধা দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনুদার হয়ে ওঠে এবং বিক্ষুব্ধ গণজাগরণের ভয়ে অত্যাচারীর রূপ গ্রহণ করে। সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি মানুষই অর্থনৈতিক সংগ্রামে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এই সংগ্রাম, হয় প্রাপ্য অর্জনের সংগ্রাম, না হয় প্রাপ্যের অধিক নিজের দখলে রাখার সংগ্রাম। বাস্তবে অথবা চিন্তায় বস্তুগত সম্পদ অধিকারের লিপ্সা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সাধারণভাবে সকল মহৎ ও সৃষ্টিশীল তাড়না আমাদের অজ্ঞাতে থাকছে। মালিকানালিপ্সা— অর্থাৎ মালিক হওয়ার ও নিজের মালিকানা রক্ষা করার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা— যুদ্ধের মূল উৎস, এবং রাজনৈতিক জগতের সকল অসুস্থতা ও দুর্ভোগের ভিত্তিস্থল। একমাত্র এই আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ডতাকে কমিয়ে দিয়ে এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ওপর থেকে এর প্রভাব হ্রাস করে নতুনতর প্রতিষ্ঠানসমূহ মানবজাতির স্থায়ী কল্যাণ সাধনে ব্রতী হতে পারে।

লোভের তাড়নাকে কমিয়ে দেবে— তেমন প্রতিষ্ঠান সম্ভব। কিন্তু তা সম্ভব হবে একমাত্র আমাদের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়ে। পুঁজিবাদ ও মজুরিপ্রথার অবশ্যই অবসান ঘটাতে হবে। এই দুই বিরাট যমজ দৈত্য পৃথিবীর প্রাণশক্তিকে গিলে খাচ্ছে। এদের জায়গায় এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে যা লুণ্ঠনলিপ্সাকে দমন করবে এবং বিলুপ্ত করে দেবে সেই অর্থনৈতিক অবিচার যার ফলে কেউ কেউ আজ আলস্যের মধ্যে দিন কাটিয়েও ধনী হবার সুযোগ পাচ্ছে আর সবাই হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও দারিদ্র্যের জ্বালায় জ্বলছে। কিন্তু সর্বোপরি আমরা এমন একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করি যা নিয়োগকারীর স্বেচ্ছাচারের অবসান ঘটিয়ে মানুষকে অভাবের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে, এবং যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে মানুষ জীবিকা অর্জন করে তার নিয়ন্ত্রণে তাকে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সুযোগ দেবে। একটা উন্নততর

www.pathagar.com

ব্যবস্থায় এসব সম্ভব, এবং যে অন্যায়সমূহ সহ্য করার পেছনে কোনো কারণ নেই সেগুলো যখন মানুষের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবে, তখন গণতন্ত্রের দ্বারাই সেই উন্নততর ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে।

একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চারটি বিভিন্ন লক্ষ্য থাকতে পারে। প্রথমত, তার লক্ষ্য হতে পারে যতদূর সম্ভব বেশি বস্তুসম্পদ উৎপাদন করা ও যান্ত্রিক অগ্রগতিকে সহজসাধ্য করা। দ্বিতীয় লক্ষ্য হতে পারে বণ্টনব্যবস্থার সুবিচার। তৃতীয়ত, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। চতুর্থ লক্ষ্য হতে পারে, সৃজনী তাড়নার স্ফুরণ ঘটিয়ে স্বত্বলিপ্সাকে দুর্বল করে দেয়া।

এই চারটি উদ্দেশ্যের মধ্যে শেষেরটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তার গুরুত্ব প্রধানত এরই উপায় হিসেবে। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের দ্বারা যদিও নিরাপত্তা বিধান ও বর্তমান অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি ন্যায়বিচার অর্জন সম্ভব, তথাপি সৃজনী তাড়নার স্ফুরণে এবং প্রগতিশীল সমাজ গঠনে সম্ভবত তা ব্যর্থ হবে।

আমাদের বর্তমান ব্যবস্থা এ চারটি বিষয়ের প্রত্যেকটির বেলায়ই ব্যর্থ। তবু একে রক্ষা করা হচ্ছে প্রধানত এই যুক্তিতে যে, উল্লিখিত চারটি উদ্দেশ্যের প্রথমটি— অর্থাৎ সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ বস্তুসম্পদ উৎপাদন— এর দ্বারা সাধিত হচ্ছে। কিন্তু তা-ও সাধিত হচ্ছে নিতান্তই অদূরদর্শী ও অবিমৃষ্যকারী উপায়ে— এমন একটা পদ্ধতিতে যার ফলে পরিণামে মানবিক শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ উভয়েরই শুধু অপচয় ঘটছে।

পুঁজিবাদী কর্মপ্রচেষ্টার পেছনে কেবল উপস্থিত বর্তমানে ও আসন্ন ভবিষ্যতে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন লাভের একটা বিবেচনাহীন বিশ্বাস জড়িত থাকে। এই বিশ্বাসবশত ভূপৃষ্ঠের নতুন নতুন অংশকে ক্রমেই শিল্পায়িত করে তোলা হচ্ছে। আফ্রিকার বিশাল এলাকাকে র‍্যান্ড, রোডেশিয়া ও কিম্বার্লির স্বর্ণ ও হীরক খনিসমূহের জন্য শ্রমিক সংগ্রহের এলাকায় পরিণত করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে সেসব অঞ্চলের জনগণকে সাহসহীন, কর-ভারাক্রান্ত, বীতশ্রদ্ধ ও ইউরোপীয় পাপসমূহে কলুষিত করে তোলা হচ্ছে। দক্ষিণ ইউরোপের বলিষ্ঠ এবং শক্তিশালী জাতিসমূহ আমেরিকার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, এবং সেখানে হাড়ভাঙা খাটুনি ও ঘিঞ্জি বস্তির পরিবেশ তাদের প্রকৃত মৃত্যু না ঘটালেও জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে। আমাদের শহরাঞ্চলের জনসাধারণ যে অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছে তাতে তাদের জীবনের কী পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে তা সকলেরই জানা। আর মানবিক শক্তির এই অপচয়ের মতোই পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদসমূহেরও অপচয় ঘটছে। পৃথিবীর খনি, বন ও শস্যক্ষেত্রগুলোকে যে

www.pathagar.com

অবিমৃষ্যকারী উপায়ে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে অচিরেই সেগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। বস্তুগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃথিবী অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হচ্ছে, পৃথিবীর সকল শক্তি কিছু একটা আশু উৎপাদনের জন্য চরম বিকারগ্রস্তের মতো মেতে উঠেছে, একং তা কী ও কতটুকু মূল্যের বিনিময়ে উৎপাদিত হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছুই ভাবা হচ্ছে না। তথাপি এই ব্যবস্থাকে প্রগতির রক্ষাকবচ বলে অভিহিত করে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে।

অন্য যে তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে তাদেরও কোনোটির বেলায় যে আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এর চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করছে তা বলা যায় না। পুঁজিবাদ ও মজুরিপ্রথার অসংখ্য অভিশাপের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হল : এর দ্বারা মানুষের লুণ্ঠনলিপ্সা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থনৈতিক অবিচার অনুমোদিত থাকছে এবং এতে মালিকের বা বিনিয়োগকারীর শোষণ-নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার সব সুযোগ অব্যাহত থাকছে।

লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি সম্পর্কে মোটামুটি এটাই বলা যায় যে, মানুষ যদি প্রাকৃত অবস্থায় বাস করত, তাহলে তাতে ধনার্জনের পথ হত দুটি— একটি উৎপাদনের ও অপরটি লুণ্ঠনের। বর্তমান অবস্থায় লুণ্ঠন বলতে যা বোঝায় তা নিষিদ্ধ হলেও জাতীয় সম্পদে কিছুই দান না করে ধনী হয়ে ওঠার অনেক উপায়ই রয়েছে। ভূ-সম্পত্তি অথবা পুঁজির মালিকানা— তা অর্জিতই হোক অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তই হোক— এটা স্থায়ী আয়ের আইনসঙ্গত অধিকার দেয়। যদিও বাঁচার তাগিদে প্রায় সমস্ত লোককেই উৎপাদন করতে হয় তথাপি স্বল্পসংখ্যক সুবিধাভোগী লোক কিছুই উৎপাদন না করেও বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাতে পারে। অথচ এরা শুধু সৌভাগ্যেরই অধিকারী নয়, সবচেয়ে বেশি সম্মানেরও অধিকারী। তাই তাদের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার জন্যই সাধারণভাবে সকলে অভিলাষী, এবং তাদের আয় যে ন্যায়সঙ্গত নয়, এ সত্যটির সম্মুখীন হতে সাধারণভাবে সকলেই অনিচ্ছুক। কোনো রকম পরিশ্রমের বালাই ছাড়াই যে তারা ভাড়া ও সুদ ভোগ করে, সে কথা বাদ দিলেও তাদের সম্পদ আহরণের সমস্তটা পদ্ধতিই হল নিতান্ত ডাকাতি। মানুষ যে সম্পদের সৌভাগ্য অর্জন করে, তা সাধারণত কখনো কোনো মঙ্গলকর আবিষ্কারের বিনিময়ে, কিংবা জাতীয় সমৃদ্ধি ঘটায় এমন কোনো কাজের প্রতিদানে নয়। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তা হয়ে থাকে, অন্যকে নিজের কাজে খাটাবার অথবা অন্যকে প্রতারিত করার হীন নৈপুণ্যের সাহায্যে। আমাদের বর্তমান বিধি-ব্যবস্থা যে কেবল ধনীদের হীন পন্থায় ধনার্জনের লিপ্সাকে বৃদ্ধি করে তাই নয়, এ ব্যবস্থায় প্রায় সকল মানুষই

www.pathagar.com

প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের ভয়ে সমস্ত সময় ও চিন্তাকে অর্থনৈতিক সংগ্রামে নিয়োজিত রাখতে বাধ্য হয়। এই ব্যবস্থায় মোট জাতীয় সম্পদের নির্ধারিত সময়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বলে একটা থিওরি চালু আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ থিওরি পুরোপুরিই ভুল। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

অর্থনৈতিক অবিচারই সম্ভবত আমাদের বর্তমান ব্যবস্থার সবচেয়ে স্পষ্ট অন্যায়। এটা নিতান্তই একটা অদ্ভুত রীতি, যারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর সম্পদের অধিকারী, তারা সমাজে শ্রমজীবী মানুষদের অপেক্ষা উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। একথা মানতে আমি প্রস্তুত নই যে, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য প্রত্যেক মানুষেরই আয় সমান হওয়া প্রয়োজন। এক ধরনের কাজ অন্য ধরনের কাজের চেয়ে কর্মদক্ষতার বিচারে অধিক আয়ের দাবি রাখে। কিন্তু অর্থনৈতিক অবিচার হয় তখনই, যখন কাজের নৈপুণ্যের জন্য যা প্রাপ্য তার অতিরিক্ত বা বিশেষ কোনো অবদানের জন্য যে পুরস্কার প্রাপ্য তার অতিরিক্ত কিছু কেউ পায়। এটা এতই স্পষ্ট বিষয় যে, এর কোনো বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ট্রাস্ট, কার্টেল, সিন্ডিকেট ইত্যাদি আধুনিক ক্রমবর্ধমান একচেটিয়া ব্যবস্থাসমূহ সমাজের ওপর পুঁজিপতিদের অর্থ আদায়ের ক্ষমতাকে অত্যন্ত প্রবল করে দিয়েছে। এই প্রবণতার সমাপ্তি এমনিতেই ঘটবে না। পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা দ্বারা যারা লাভবান হচ্ছে না, তাদের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বনের মধ্য দিয়েই কেবল ঘটতে পারে এর সমাপ্তি। দুর্ভাগ্যক্রমে, সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের মনে শিল্পশ্রমিকদের ও পুঁজিপতিদের মধ্যে যে প্রখর ব্যবধানের ধারণা ছিল, বাস্তবক্ষেত্রে তা ততটা প্রখর নয়। বিভিন্ন সিকিউরিটিতে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের অর্থ নিয়োজিত রয়েছে। বন্ধুত্বপূর্ণ সোসাইটিগুলো বিরাট পুঁজির মালিক। আবার অনেক লোক সঞ্চিত অর্থ আলাদাভাবে খাটিয়ে আয় বৃদ্ধি করে। এসবের ফলে আমাদের অর্থনীতির সুস্পষ্ট আমূল পরিবর্তনের পথে প্রতিবন্ধকতা আরো বেড়ে যায়। কিন্তু এর জন্য আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন শেষ হয় না।

ফরাসি সিনডিকালিস্টরা যে ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছেন, তাতে প্রতিটি ব্যবসা আত্মনিয়ন্ত্রিত ও সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে এবং তাদের ওপর কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। কিন্তু এর দ্বারা অর্থনৈতিক সুবিচার অর্জন সম্ভব হবে না। দরকষাকষির দিক দিয়ে কোনো কোনো পেশার লোকেরা তুলনামূলকভাবে অধিক সুবিধাজনক অবস্থাতে রয়েছে, যেমন কয়লা ও

www.pathagar.com

পরিবহন জাতীয় জীবনকে অচল করে দিতে পারে, এবং তা করার হুমকি দিয়েই স্বার্থোদ্ধার করা সম্ভব। অপরদিকে স্কুলের শিক্ষকরা অথবা ওই অবস্থার অন্য লোকেরা ধর্মঘটের হুমকি দিয়ে মোটেই কোনো ভীতির সঞ্চার করতে পারেন না। তাই দরকষাকষির দিক দিয়ে তাঁরা অত্যন্ত দুর্বল অবস্থানে রয়েছেন। স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের স্বার্থোদ্ধারের জন্য চাপ সৃষ্টির যে সুযোগ থাকে, তার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকলে কোনো ব্যবস্থা দ্বারাই কোনো সুবিচার লাভ কখনো সম্ভব হতে পারে না। এ জন্যই রাষ্ট্রের বিলোপ— যা সিনডিকালিস্টরা কামনা করেন বলে মনে হয়— তা অর্থনৈতিক সুবিচার অর্জনের পক্ষে কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে না।

যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়োগকারীর হাতে পদচ্যুত করার ও বেতন বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে ততক্ষণ মালিকের যে নিষ্ঠুরতা বর্তমানে মানুষের জীবনের সমস্ত স্বাধীনতা এবং সবরকম উদ্যোগকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তা দূর করা সম্ভব হবে না। সুষ্ঠুভাবে কাজ করার উদ্যোগ বজায় রাখার জন্য মালিকের বা নিয়োগকারীর এই অধিকারকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয়। কিন্তু মানুষ যতই সভ্য হচ্ছে ততই তার কাছে ভয়ভিত্তিক কর্মোদ্যোগের চেয়ে আশাভিত্তিক কর্মোদ্যোগ অধিক উৎকৃষ্ট বলে মনে হচ্ছে। কাজে ত্রুটি ঘটলে শাস্তি ভোগ করবে— এর চেয়ে কাজের উৎকর্ষের জন্য মানুষ পুরস্কৃত হবে— এই ব্যবস্থা অনেক ভালো। সিভিল সার্ভিসে এটা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। সেখানে কেবল অসাধারণ কোনো দোষ কিংবা অসাধারণ কোনো গুণের জন্যই কারো পদচ্যুতি ঘটে, যেমন হত্যা করা বা বেআইনিভাবে তা থেকে বিরত থাকা। কাজ করতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জীবনযাত্রা নির্বাহের নিশ্চয়তা বিধানে উপযোগী বেতন দেওয়া উচিত, এবং সে ক্ষেত্রে কারো কোনো কাজে নৈপুণ্য থাকলে সে কাজ সেই সময়ে প্রয়োজনীয় কি না, সে প্রশ্ন উত্থাপন না করাই সঙ্গত। যদি কারো জানা কোনো কাজের প্রয়োজন না থাকে, তাহলে প্রয়োজনীয় নতুন কাজ সরকারি খরচেই তাকে শেখাতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, ট্যাক্সি প্রবর্তনের ফলে অশ্বযানচালক অসুবিধা ভোগ করবে কেন? সে তো কোনো অন্যায় করেনি। তার কাজের প্রয়োজন যে কারণে ফুরিয়েছে, তা তো সম্পূর্ণভাবে তার আয়ত্তের বাইরে। তাকে অনাহারে না ফেলে বরং মোটর চালানো অথবা অন্য কোনো সুবিধাজনক কাজ শিক্ষা দেওয়া উচিত। বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে যে কোনো পরিবর্তনের ফলেই শ্রমিকদের একাংশকে দারুণ অসুবিধায় পড়তে হয়। ফলে

www.pathagar.com

শ্রমিকদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের রক্ষণশীলতা এবং নতুন কোনো ব্যবস্থা, উপায় ও নিয়ম প্রবর্তনের প্রতি অনীহা দেখা দেয়। এ ধরনের পরিবর্তন যদি সমাজের স্থায়ী মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে সেগুলোর রূপায়ণ অবশ্যই ঘটাতে হবে। কিন্তু সেগুলো দ্বারা যাতে, যারা পুরনো ব্যবস্থায় কাজ করে আসছে এবং যাদের কাজ আর প্রয়োজনে লাগবে না— তাদের ক্ষতি না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষের সহজাত রক্ষণশীলতার দরুন উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের গতি অবশ্যই প্রয়োজনের তুলনায় ধীর হবে। দুঃখের বিষয়, পরিবর্তন সাধনের বর্তমান অনুচিত পদ্ধতি দ্বারা সংগঠিত শ্রমশক্তির ওপর জোর করে কিছু চাপাতে গিয়ে যেসব রক্ষণশীলতার অবসান সহজসাধ্য, সেগুলোকেও জটিল করে তোলা হয়, এবং তাতে সহজাত রক্ষণশীলতা আরো শক্তিশালী হয়।

বলা হবে যে, পদচ্যুতির ভয়ের লাগাম কষা না থাকলে মানুষ ভালোমতো কাজ করবে না। আমি মনে করি, অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক লোকের বেলায়ই বর্তমানে একথা প্রযোজ্য। আর যাদের বেলায় একথা প্রযোজ্য তাদেরকেও যদি মনের মতো কাজ অথবা আরো উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে তারা সহজে পরিশ্রমী হয়ে উঠতে পারে। এসব প্রক্রিয়া অবলম্বন করেও যাদেরকে পরিশ্রমী করে তোলা যাবে না তাদেরকে দণ্ডবিধির আওতায় না ফেলে চিকিৎসনীয় ব্যক্তি বলে ধরে নিয়ে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। জীবিকার ভয়াবহ অনিশ্চয়তা এবং চাকরির নিদারুণ অনিয়মের ফলে যে বিপুলসংখ্যক মানুষ আজ ভগ্নস্বাস্থ্য ও ভগ্নমনোবলের দশায় নিপতিত, তাদেরকেও একই পর্যায়ে ফেলতে হবে। অনেকের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের নতুন সম্ভাবনা এনে দেবে।

মালিকের বা নিয়োগকারীর শয়তানির সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হল, অফিসের কাজের সময় ছাড়া অন্য সময়েও মানুষের কাজের ওপর তার অনধিকার হস্তক্ষেপের ক্ষমতা। নিয়োগকারী যদি কোনো লোকের ধর্ম অথবা রাজনৈতিক মত অপছন্দ করে, কিংবা তার ব্যক্তিগত জীবনকে খারাপ বলে ধারণা করে, তাহলে সেই কারণেই তার পদচ্যুতি ঘটতে পারে। তিনি যদি তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে কোনো রকম স্বাধীন চেতনা জাগাবার চেষ্টা করেন, তা হলেই তাঁর পদচ্যুতি ঘটতে পারে। কোনো ব্যক্তি সাধারণের চেয়ে বেশি শিক্ষিত সুতরাং বেশি বিপজ্জনক— এ কারণেও তাঁর কোনো জায়গায় কোনো রকম চাকরি জোটা সম্পূর্ণ অসম্ভব হতে পারে। বর্তমানে এ ধরনের সব ঘটনাই বাস্তবে ঘটে চলেছে। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের দ্বারা এসব অন্যায়ের

www.pathagar.com

প্রতিকার হবে না, বরং তাতে এসব অন্যায় আরো বাড়বে; কারণ, বর্তমানে মতপার্থক্যের ফলে নিয়োগকারীর দিক থেকে কখনো কখনো পক্ষপাতমূলক যেসব অন্যায় দেখা দেয়, রাষ্ট্রই যেখানে একমাত্র নিয়োগকারী সেখানে রাষ্ট্রের দিক থেকে ওই ধরনের পক্ষপাতমূলক অন্যায় দেখা দিলে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো আশ্রয়স্থলই থাকবে না। তাতে রাষ্ট্র তার পছন্দমতো যে কোনোরকম ব্যবস্থাকেই চাপিয়ে দিতে পারবে, এবং এটা প্রায় নিশ্চিত যে, তাই ঘটবে। তাতে চিন্তার স্বাধীনতার জন্য মানুষকে দণ্ডিত হতে হবে, এবং সর্ব প্রকার স্বাধীন মনোবলের মৃত্যু ঘটবে।

যে কোনো রকম কঠোর বা অনমনীয় ব্যবস্থাতেই এই অন্যায় বর্তমান থাকবে। বৈচিত্র্য থাকা এবং সম্পূর্ণ প্রণালিবদ্ধতা না থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সংখ্যালঘুদের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে। এই নিশ্চয়তা না থাকলে পর-পীড়নের ও সমরূপতা প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি সকল মানুষকে একই ছাঁচে গড়ার অপচেষ্টা চালাবে এবং সবরকম প্রগতির পথ অবরুদ্ধ করে দেবে।

এসব কারণে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষ কাজ করতে 'ইচ্ছুক' ততক্ষণ তাকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের গ্রাসে নিক্ষিপ্ত হতে দেয়া উচিত নয়। তার মতামত এবং ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত বিষয়েও কোনো রকম অনুসন্ধান উচিত নয়। একমাত্র এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব যার মূলে শয়তানি ও সন্ত্রাসের সুযোগ থাকবে না।

দুই

অর্থনৈতিক সংস্কারকদের ক্ষমতা শ্রমের প্রযুক্তিগত উৎপাদন ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। যতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র মানবজাতির জীবিকা সংগ্রহার্থেই প্রায় সকল লোককে রাতদিন কাজ করতে হত, এবং জীবিকার অতিরিক্ত উৎপাদন সামান্যই সম্ভব হত, ততদিন আভিজাত্যবাদ ছাড়া অন্য কোনো রকম সভ্যতা সম্ভব ছিল না; তখন কোনো শ্রেণির মানুষ যদি মানসিক জীবনে প্রচুর বিশ্রাম লাভ করত, তাহলে সেই মুষ্টিমেয়দের সুবিধার জন্য অন্যদের চরমত্যাগ স্বীকার করতে হত। কিন্তু যেকালে ওই ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, যান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেকাল অতীত হয়েছে। যদি প্রজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্মিত হত, তাহলে বর্তমানে যারা মানসিক অনুশীলনের তাগিদ অনুভব করেন

www.pathagar.com

তাঁদের সকলেরই তা মেটাবার সুযোগ ঘটত। দৈনিক মাত্র কয়েক ঘণ্টার শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই মানুষ নিজের নিজের বাঁচার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু উৎপাদন করতে সক্ষম হত, এবং কেউ যদি বিলাসিতা থেকে বিরত থাকতে চাইত তাহলে সমাজ তার কাছ থেকে কেবল ওইটুকু শারীরিক শ্রম দাবি করেই ক্ষান্ত থাকত। কেউ যদি কম সময় পরিশ্রম করে কম বেতন নিতে এবং অবসর সময় নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোনো কাজে খাটাতে চায় তাহলে তার সামনে সে সুযোগ থাকা উচিত। যাঁরা এ পথ পছন্দ করবেন, সন্দেহ নেই, তাঁদের অধিকাংশ বর্তমান ধনী লোকদের মতো নিতান্ত আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাবেন। কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে, তেমন সমাজে তাঁরা অন্যের পরিশ্রমের ওপর প্যারাসাইটের মতো পরজীবী হবেন। আর তাঁদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক দেখা যাবে, যাঁরা বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য ইত্যাদির চর্চা করবেন— যার ফলে প্রকৃতপক্ষে কিছু মৌলিক প্রগতি সম্ভব হবে। এসব ব্যাপারে প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা কেবল অনিষ্টই করতে পারে। এক্ষেত্রে একমাত্র যা করা যেতে পারে তা হল, সুযোগ প্রদান এবং বেশিরভাগ লোকের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারার ফলে যে অপচয় ঘটে, তার জন্য আক্ষেপ না করা।

কিন্তু অস্বাভাবিক আলস্য ও অসাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা বাদ দিলে প্রায় সকল মানুষই পূর্ণ সময় কাজ করে পূর্ণকালীন বেতন লাভ করতে চাইবে। জনসংখ্যার এই বৃহত্তম অংশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সাধারণ কাজ যতদূর সম্ভব তাঁদের আগ্রহ, স্বাধীনতা ও উদ্যম প্রকাশের উপযোগী হওয়া। মানুষের আয় যখনই একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে তখনই এসব জিনিস অর্থ আয়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দাবি করে। গিল্ড সমাজতন্ত্র ও শিল্পের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দ্বারা এগুলো লাভ করা যাবে; অবশ্য তার ওপর অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। আমি যতদূর উপলব্ধি করি, অন্য কোনো উপায়ে এসব অর্জন করা সম্ভব হবে না।

মিস্টার ওরেজ এবং 'নিউ এজ' পত্রিকা যে গিল্ড সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন, তা 'রাজনৈতিক' কার্যক্রমের বিরোধী ও বিতর্কমূলক, এবং তা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী। সিন্ডিকালিজমে এই ধারণা স্বীকৃত, এবং এর মধ্যে যা নতুন তা সিন্ডিকালিজম থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু এ ধরনের মনোভাব পোষণের কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। আমার মনে হয়, নিজ নিজ স্থান-কালে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম দুই-ই সমান প্রয়োজনীয়। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রাষ্ট্রযন্ত্রকে সমাজতান্ত্রিক

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে গেলে তা বিপজ্জনক হবে বলে আমি মনে করি। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যে পরিবর্তন আমরা কামনা করি, তার সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের রূপান্তরের জন্য পরিবর্তিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন অপরিহার্য। এদেশে আকস্মিক বিপ্লবের সাহায্যে রূপান্তর সাধন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। পরিবর্তন করতে হলে এ দুই ক্ষেত্রেই ধীর পরিবর্তনের কথা আমাদের ভাবতে হবে। আমার মনে হয় না যে, এ দুটির একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমরা দেখতে চাই তাতে রাষ্ট্রই হবে একমাত্র অর্থনৈতিক কর গ্রহণকারী, এবং বেসরকারি পুঁজিবাদী উদ্যোগসমূহের দায়িত্ব হস্তান্তরিত হবে যারা প্রকৃতপক্ষে কাজ করে তাদের যৌথ আত্মনিয়ন্ত্রণে। কোনো লোক সারাদিন কাজ করে সারাদিনের মজুরি নেবে, না অর্ধেক দিন কাজ করে অর্ধেক দিনের মজুরি নেবে— তা হবে সম্পূর্ণ ওই ব্যক্তিরই ইচ্ছাধীন। যেসব ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থায় বাস্তব অসুবিধা দেখা দেবে শুধু সেসব ক্ষেত্রকেই ব্যতিক্রম হিসেবে ধরতে হবে। কোনো লোকের কাজ যদি হঠাৎ অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায় তা হলে তার বেতন বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত নয়; বরং যতক্ষণ সে কাজ করতে আগ্রহী, ততক্ষণ তার বেতনও চালু থাকা উচিত, এবং সেইসঙ্গে প্রয়োজনবোধে সরকারি খরচে তাকে নতুন কোনো কাজ শেখানো উচিত। সুবিধাজনক পেশায় নিয়োগ করার পরেও কেউ কাজে অনিচ্ছুক হলে তার জন্য চিকিৎসামূলক অথবা শিক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

এক-একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সকলে এক-একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংগঠিত হবেন, এবং তাঁদের কাজ সকল প্রকার বাহ্য নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবে। রাষ্ট্র কেবল যে মূল্যে তারা উৎপাদন করে সেই মূল্য নির্ধারণ করবে, তা ছাড়া আর সকল ব্যাপারেই শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্বায়ত্তশাসিত থাকবে। মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে রাষ্ট্র যতদূর সম্ভব প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে নিজের নিজের প্রণালিতে উন্নতি সাধনের ও লাভবান হবার সুযোগ দেবে, কিন্তু বাইরের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে কোনো অবাঞ্ছিত ক্ষতির অথবা লাভের সুযোগ রোধ করারও চেষ্টা করবে। এতে প্রত্যেকেরই উদ্যোগ থাকবে উন্নতি সাধনের দিকে, এবং তাতে দারিদ্র্যের অভিশাপের সম্ভাবনাও কমে যাবে। আর যদিও বিরাট বিরাট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকবে, তবু তাদের ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত ও বিভক্ত হবে। তার ফলে বর্তমানে মানুষ ব্যক্তিগত অসহায়ত্বের যে মনোভাবে ভুগছে তার অবসান ঘটবে।

www.pathagar.com

এই ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তনই কাম্য— একথা স্বীকার করেও কিছু লোক বিতর্কের খাতিরে বলবেন যে, এর বাস্তবায়ন অসম্ভব, কাজেই আরো প্রত্যক্ষ ও সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের দিকেই আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

আমি মনে করি, এটা অবশ্যস্বীকার্য যে, কোনো রাজনৈতিক দলের দীর্ঘমেয়াদি বা সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এমন সব স্বল্পমেয়াদি বা অব্যবহিত লক্ষ্য ও কার্যক্রমও থাকা উচিত যেগুলো তাঁরা পার্লামেন্টের পরবর্তী অধিবেশনে বা পরবর্তী পার্লামেন্টে পাস করাতে আশা করবেন। আমার মনে হয়, জার্মানিতে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণ, সংখ্যার দিক দিয়ে যদিও দলটি শক্তিশালী ছিল তবু রাজনৈতিক দিক দিয়ে ছিল দুর্বল, কারণ বিপ্লবের জন্য যখন উক্ত দল অপেক্ষা করছিল তখন ছোট ছোট দাবি আদায়ের কোনো কর্মসূচি তার ছিল না। এর চেয়ে কিছু কম অবাস্তব কর্মনীতি যাঁদের কাম্য ছিল, তাঁরা যখন শেষে জার্মান সমাজতন্ত্রের নেতৃত্বে এলেন তখন যে পরিবর্তন সাধন করা হল তা-ও ছিল একই রকম ভুল : যুদ্ধবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও অন্যান্য ক্ষতিকর কর্মনীতি গ্রহণ করা হল, আর আংশিক সংস্কারও পরিহার করা হল। আংশিক সংস্কার যতই অপর্যাপ্ত হোক, একটা সঠিক পথ ধরে চলতে পারত।

যুদ্ধের পূর্বেকার ফরাসি সিন্ডিকালিজমের নীতিতেও একই রকম ভুল ছিল। সব কিছুতেই সাধারণ ধর্মঘটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে; উপযুক্ত প্রস্তুতির পর একদিন সমগ্র শ্রমিকশ্রেণি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অস্বীকার করবে, এবং তাতে সম্পত্তির মালিকেরা পরাজয় স্বীকার করবে ও উপবাস না করে বরং নিজেদের সবরকম সুবিধা ত্যাগ করতে রাজি হবে— এ এক নাটকীয় ধারণা। নাটকপ্রীতি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির ঘোরতর শত্রু। মানুষ দীর্ঘদিন ধরে যা করে এসেছে, আকস্মিকভাবে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কিছু করার শিক্ষা নিতান্ত ব্যতিক্রম কিছু ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণত তাদেরকে দেওয়া সম্ভব হয় না। যদি সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করতে হত তাহলে বিজয়ীদেরকে নৈরাজ্যবাদের দর্শন সত্ত্বেও বাস্তবে বাধ্য হয়ে একটা প্রশাসন গড়ে তুলতে হত, লুটতরাজ দমন করে ধ্বংস রোধ করার জন্য নতুন পুলিশ বাহিনী গঠন করতে হত, বিপ্লবীদের বিভিন্ন দলকে এককেন্দ্রিক আদেশ দ্বারা পরিচালনা করার জন্য একটি অস্থায়ী সরকার পর্যন্ত গঠন করতে হত। কিন্তু সিন্ডিকালিস্টরা ছিলেন নীতিগতভাবে সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রমের বিরোধী। তাই তাঁরা মনে করতেন প্রয়োজনীয় বাস্তব

www.pathagar.com

পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁরা তাঁদের তত্ত্ব থেকে দূরে সরে পড়বেন। এভাবে আগে থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বর্জন করার ফলে এসব ব্যাপারে তাঁদের কোনো প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা হত না। এসব কারণে মনে হয়, সিন্ডিকালিস্ট বিপ্লব যদি সংঘটিত হত, তা হলেও প্রকৃত ক্ষমতা গিয়ে পড়ত এমন লোকদের হাতে যাঁরা আসলে সিন্ডিকালিস্টই হতেন না।

দীর্ঘ সময় পরে আকস্মিকভাবে বিপ্লব সাধন অথবা ধর্মঘটের দ্বারা যে কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে হবে তার সম্পর্কে আর একটা আপত্তি এই যে, এতে অন্তর্বর্তীকালে কিছুই করার থাকে না বলে সমস্ত উদ্যম নিস্পৃহতায় পর্যবসিত হয় এবং অপেক্ষা করার ক্লান্তিকে হ্রাস করার মতো কোনো রকম আংশিক সাফল্যও সম্ভব হয় না। এই প্রক্রিয়ায় একমাত্র যে ধরনের আন্দোলন সফল হতে পারে তার মধ্যে ভাবাবেগ এবং কর্মসূচি দুই-ই হয় অত্যন্ত সরল—যেমনটি নির্যাতিত জাতিসমূহের বিদ্রোহের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কিন্তু তুর্কি ও আর্মেনিয়ানদের মধ্যে কিংবা ইংরেজ ও ভারতবাসীদের মধ্যে ব্যবধান যত প্রখর, পুঁজিপতি ও মজুরিজীবীদের মধ্যে ব্যবধান তত প্রখর নয়। সমাজবিপ্লবের কথা যাঁরা বলেছেন তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নির্ণয়ে ভুল করেছেন প্রধানত এই জায়গায় যে, তাঁরা বুঝতে পারেননি সমাজে এমন লোক কতজন আছেন যাঁদের স্বার্থ ও সমর্থন অর্ধেক পুঁজির দিকে এবং অর্ধেক শ্রমের দিকে। নিতান্ত সরলীকৃত বিপ্লবী কর্মনীতিকে এই মধ্যবর্তী লোকেরাই জটিল করে তোলেন।

এসব কারণেই যাঁরা অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য চেষ্টা করেন এবং ধারণা করেন যে তা রাতারাতি সম্ভব হবে না, তাঁরা যদি সাফল্যের সম্ভাবনা দেখতে চান, তাহলে তাঁদেরকে অবশ্যই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে ধাপে ধাপে, এবং অবলম্বন করতে হবে এমনসব প্রক্রিয়া যেগুলোর নিজস্ব প্রয়োজন রয়েছে। এই ধরনের প্রক্রিয়া যদি শেষপর্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত পরিণতির দিকে নিয়ে না যায়, তবু তা অবলম্বন করতে হবে। শেষপর্যন্ত কোথায় পৌঁছাতে হবে মানুষকে তা শিক্ষা দেয়ার মতো কর্মধারা থাকতে হবে, কিন্তু সেইসঙ্গে থাকতে হবে নিকটবর্তী ভবিষ্যতে অর্জন করার মতো সম্ভাব্য সাফল্যের কর্মসূচিও। শুধুমাত্র দূরবর্তী ভবিষ্যতে স্বর্গ লাভের অস্পষ্ট আশা কোনো কাজে আসে না।

এসব কিছুকে যেমন আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি, তেমনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, গুরুত্বপূর্ণ আমূল পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে অত্যাসন্ন ভবিষ্যতের দিকে যে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে, তাকে অনেক সুদূরপ্রসারী করা প্রয়োজন; আরো

www.pathagar.com

প্রয়োজন, মানবজাতি ইচ্ছা করলে মানবজীবনকে কত সুন্দর ও মধুর করে তুলতে পারে তার উপলব্ধি। এ ধরনের কোনো আশা ছাড়া মানুষ প্রতিকূলতাকে জয় করার মতো শক্তি এবং উৎসাহ লাভ করতে পারবে না, এবং যখন সাময়িকভাবে তাদের আদর্শ অপ্রিয় হয়ে দাঁড়াবে তখন তাকে রক্ষা করার মতো দৃঢ়তাও থাকবে না: জীবনপরিস্থিতির বিরাট উন্নতি সাধনের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা যাঁরা তাড়িত, তাঁদের প্রত্যেককেই প্রথমে সম্মুখীন হতে হয় বিদ্রূপের, তারপর নির্যাতনের, তারপর তোষামোদ ও চতুরতার আবরণে আচ্ছাদিত দুর্নীতির। দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা জানি, কত অল্পসংখ্যক লোক অক্ষত অবস্থায় এই তিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। শেষেরটিই সবচেয়ে বিপজ্জনক— প্রকৃতপক্ষে তাতে উত্তীর্ণ হওয়া প্রায় অসম্ভব। ওই অবস্থায় সংস্কারকে প্রলুব্ধ করার জন্য তাঁর সামনে পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্য এনে হাজির করা হয়। স্বচ্ছ ও সঠিক চিন্তার ফলে যাঁরা নিজেদের লক্ষ্যস্থলকে উজ্জ্বলভাবে দেখতে পান, কেবল তাঁদের পক্ষেই তখন উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য সম্পর্ক রয়েছে বস্তুগত উৎপাদন ও বণ্টনের সঙ্গে। আমাদের বর্তমান ব্যবস্থা উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপচয়শীল ও বণ্টনের বেলায় অন্যায়াশ্রয়ী। এর ফলে যে অর্থনৈতি শক্তিসমূহের দ্বারা সমাজের বৃহত্তম অংশ গঠিত, সেসব শক্তির অন্তর্গত প্রতিটি মানুষের জীবন থাকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর অপর দিকে স্বল্পসংখ্যক লোক অন্য সকলের ওপর এমন বিরাট ক্ষমতার অধিকারী থাকে যা কোনো লোকেরই থাকা উচিত নয়। ভালো সমাজব্যবস্থায় বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের কাজ হবে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় দিক রচনার নিতান্তই প্রাথমিক ভিত্তি। অবশ্য যাঁরা প্রয়োজনের জিনিস তৈরির কোনো কাজে আনন্দ লাভ করেন তাঁদের কথা আলাদা। বর্তমান ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক প্রয়োজনই মানুষকে সম্পূর্ণভাবে চালিত করছে। এটা নিতান্তই অনভিপ্রেত ও অপ্রয়োজনীয়। এই অবস্থাকে বর্তমান অপরিহার্য করে তোলা হয়েছে আংশিকভাবে সম্পদের অনুচিত বণ্টনের দ্বারা এবং আংশিকভাবে শিক্ষা প্রভৃতি জীবনের প্রকৃত মূল্যবান বিষয়সমূহকে একমাত্র ধনীদের ছাড়া অন্য সকলের জন্য দুর্লভ করে রেখে।

ন্যায়বিচারের জন্য কিংবা সমাজের প্রয়োজনীয় সম্পদ উৎপাদনের পদ্ধতি হিসেবে জমি ও পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আপত্তি হল : এর দ্বারা

www.pathagar.com

মানুষের জীবনের বিকাশ ব্যাহত হয়, সর্বক্ষেত্রে নিষ্ঠুর স্বত্বাধিকারলিপ্সা সযত্নে লালিত হয় এবং এই লিপ্সাই সাফল্যও অর্জন করে। এই ব্যবস্থা মানুষকে বাধ্য করে কেবল বস্তুগত সম্পদ অর্জনে তার প্রায় সমস্ত সময় ও চিন্তা নিয়োজিত রাখতে, আর সভ্যতা ও সৃজনশক্তির বিকাশের পথে এই ব্যবস্থা সৃষ্টি করে মারাত্মক বাধা।

এইসব অন্যায় থেকে মুক্ত কোনো ব্যবস্থার দিকে এগুতে হলে তা আকস্মিক হওয়ার প্রয়োজন নেই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া অবশ্যই সম্ভব। এ কথা সত্য নয় যে, আমরা যে ধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবছি তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোনোরকম বাহ্য অসুবিধা রয়েছে। যদি সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমশক্তি তা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে কোনো কিছুই তাকে ব্যাহত করতে পারবে না। এক্ষেত্রে যেসব সমস্যা অতিক্রম করা দরকার সেগুলো হল : মানুষকে আশা দ্বারা অনুপ্রাণিত করা, মানুষের মধ্যে এমন কল্পনা জাগাতে হবে যাতে তারা দেখতে পায় যে, যেসব অন্যায়ের জ্বালায় তারা জ্বলছে সেগুলোতে জ্বলবার কোনো কারণ তাদের নেই। অন্যায় থেকে মুক্তিলাভের উপায় যাতে তারা বুঝতে পারে, তার জন্য তাদের মধ্যে উপযুক্ত চিন্তা জাগাতে হবে। সময় ও শক্তি খরচ করে এসব সমস্যাকে জয় করা সম্ভব। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি যদি প্রসারিত না হয়, কল্পনা না থাকে, একমাত্র বর্তমান ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই সামান্য ভাসা ভাসা উন্নতি সাধনের ঊর্ধ্বে যদি বড় কোনো আশা তাঁদের মনে না জাগে, তাহলে এসব সমস্যা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু বৈপ্লবিক চিন্তা অপরিহার্য। আর চিন্তা থেকেই জন্ম নিতে পারে যৌক্তিক ও গঠনমূলক আশা।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজতন্ত্রের ত্রুটির দিক

গোড়ার দিকে সমাজতন্ত্র ছিল একটি বৈপ্লবিক আন্দোলন। তার উদ্দেশ্য ছিল মেহনতি মানুষের মুক্তিসাধন এবং স্বাধীনতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা। এর সম্ভাব্য পদ্ধতি ছিল পুঁজিবাদ থেকে বলপূর্বক আকস্মিকভাবে নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন : কোনো ক্ষতিপূরণ না দিয়ে ধনিক শ্রেণিকে সম্পত্তিচ্যুত করা এবং তাদের ক্ষমতার শূন্যস্থানে অন্য কোনো নতুন কর্তৃপক্ষ না বসানো।

ক্রমে সমাজতন্ত্রের এই মূল উদ্দীপনায় পরিবর্তন সূচিত হয়। ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রীরা সরকার পরিচালনায় অংশ নেন, পরিষদে সংখ্যাধিক্য গড়ে তোলেন ও ভেঙে দেন। জার্মানিতে সোশ্যাল ডেমোক্রেসি এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে কতকগুলো সম্পূর্ণ আপোসহীন পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁদের দাবির সরকারি স্বীকৃতি অর্জনের লোভ সংবরণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইংল্যান্ডে ফ্যাবিয়ানরা বিপ্লবের বদলে সংস্কারের এবং আপোসহীন সংগ্রামের বিরুদ্ধে আপোসমূলক দরকষাকষির সুবিধার কথা প্রচার করেন।

বিপ্লবের পদ্ধতির তুলনায় ক্রমিক সংস্কারের পদ্ধতির সুবিধা অনেক বেশি। আর বিপ্লব প্রচারের কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। কিন্তু ক্রমিক সংস্কারের পথে কতকগুলো বিপদ রয়েছে, যেমন ব্যবসার মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ এখনো ব্যক্তিগত, এবং এ ধরনের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির মেহনতি মানুষের মঙ্গলের জন্য আইন প্রণয়ন কিংবা আইনগত হস্তক্ষেপকে উৎসাহিত করার নামে। গোড়ার দিকের সমাজতন্ত্রীরা যে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং যে আদর্শ এখনো সকল প্রকার সমাজতন্ত্রীর প্রায় সকলকেই অনুপ্রাণিত করে, ক্রমিক সংস্কারের বিভিন্ন উপায় তাতে আদৌ কিছু দান করতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে অন্তত কৌতূহলী হওয়ার অবকাশ আছে।

---

১. ইংল্যান্ডে তা ১৯৪৭ সনে হয়েছে

www.pathagar.com

উদাহরণ স্বরূপ রেলপথের রাষ্ট্রীয়করণের কথা ধরা যাক। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের এ হল এক আদর্শ দৃষ্টান্ত, এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব— অনেক দেশে তা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।[১] আর যৌথ মালিকানার ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে এটি হচ্ছে একটি প্রকৃষ্ট পদক্ষেপ। তথাপি এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ আমি দেখি না যে, রেলপথের মালিকানার যৌথ অংশীদারদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে রেলপথের রাষ্ট্রীয়করণ করা হলে তা দ্বারা গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের পথে সত্য সত্যই কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়।

কর বা সুদ আদায়কারীদের কাছে জাতীয় আয়ের যে অংশ চলে যায়, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য তার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটাতে পারলেও হ্রাস-সাধন অপরিহার্য। কিন্তু রেলপথের অংশীদারদেরকে শেয়ারের পরিবর্তে যদি সরকারি স্টক প্রদান করা হয়, তাহলে তাদেরকে চিরদিনের জন্য এমন একটি আয়ের সুযোগ দেয়া হয় যা, শেয়ার থেকে তারা যে আয় আশা করত তার সমান। রেলপথের আয়ের পর্যাপ্ত বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকলে এ ধরনের উপায় অবলম্বন দ্বারা সম্পদের বণ্টনব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। পরিবর্তন ঘটতে পারে একমাত্র তখনই, যখন কোনো ক্ষতিপূরণ না দিয়ে বর্তমান মালিকদের সম্পত্তিচ্যুত করা হয়, কিংবা ক্ষতিপূরণ দিলেও বাজারদরের চেয়ে কম মূল্যে দেওয়া হয়, অথবা তাদেরকে কেবলমাত্র সামান্য জীবনস্বত্ব ভোগের সুযোগ দেয়া হয়। সম্পূর্ণ মূল্য যদি দিয়ে দেয়া হয় তাহলে অর্থনৈতিক ন্যায়ের পথে কোনো অগ্রগতি হয় না।

স্বাধীনতা সম্পর্কেও একই কথা— এতে স্বাধীনতার পথেও কোনো অগ্রগতি ঘটে না। রেলপথে নিযুক্ত লোকেরা রেলপথের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কিংবা নিজেদের মজুরি ও কাজের অবস্থা সম্পর্কে পূর্বের চেয়ে একটুও বেশি বক্তব্য পেশ করতে পারেন না। আগে তাঁদেরকে পরিচালকদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হত এবং তাতে সরকারের নিকট আবেদন জানাবার সুযোগ থাকত। এখন প্রত্যক্ষভাবে সরকারের সঙ্গেই তাঁদের সংগ্রাম করতে হয়— এবং অভিজ্ঞতাদৃষ্টে এমন ধারণা করার কোনো কারণ নেই যে, শ্রমিকদের দাবির প্রতি সরকারি বিভাগের কোনো প্রকার বিশেষ সহানুভূতি থাকতে পারে। যদি তাঁরা ধর্মঘট করেন তাহলে সরকারের সমগ্র সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের লড়তে হয়। আর তা সম্ভব হয় তখনই যখন প্রবল জনমত তাঁদের পক্ষে থাকে। সংবাদপত্রের ওপর সরকার সব সময় যেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাতে জনমত

www.pathagar.com

তাঁদের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করবে বলেই মনে হয়, বিশেষত যখন নামেমাত্রও প্রগতিশীল কোনো সরকার ক্ষমতাসীন থাকে। আর এতে বিভিন্ন রেলপথের নীতিতে পার্থক্যের কোনো সুযোগ থাকে না। ইংল্যান্ডের কর্মচারীরা দীর্ঘকাল নর্থ ইস্টার্ন রেলপথের অপেক্ষাকৃত উদার নীতি দ্বারা উপকৃত হতেন। অন্যত্রও একই ধরনের নীতি অবলম্বনের পক্ষে যুক্তি হিসেবে এই উদাহরণ উপস্থাপন করা হত। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রাণহীন সমরূপতার মধ্যে এ ধরনের সব সম্ভাবনাই বাদ পড়ে যাবে।

আর গণতন্ত্রের পথেও এতে প্রকৃতপক্ষে কোনো অগ্রগতি ঘটে না। যেসব আমলার হাতে রেলপথের শাসনভার থাকে তাঁদের পক্ষপাতিত্বের মনোভাব ও সামাজিক সংযোগ শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব সৃষ্টি করে রাখে, এবং তাঁদের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগের অভ্যাসের ফলে স্বেচ্ছাচারিতার মনোভাব দেখা দেয়। যেসব গণতান্ত্রিক যন্ত্রের দ্বারা এই আমলারা সাধারণত নিয়ন্ত্রিত হন, সেগুলো অত্যন্ত জটিল ও পরোক্ষ। সেগুলোকে কেবল তখনই সক্রিয় করা যায় যখন বিতর্কের বিষয় এত প্রধান হয়ে দাঁড়ায় যে, তার সঙ্গে সমগ্র জাতির স্বার্থ জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও এটা স্বাভাবিক যে, আমলারা সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের শিক্ষাগত সুবিধার ফলে ও সুবিধাজনক পদাধিকারের বলে জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে দেবে এবং একান্ত সঙ্গত বিষয় সম্পর্কেও জনসাধারণের সহানুভূতিকে বিরূপতায় রূপান্তরিত করবে।

অস্বীকার করি না যে, এসব অন্যায় বর্তমানেও রয়েছে। আমার বক্তব্য কেবল এটাই যে, বর্তমান অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে রেলপথের জাতীয়করণের মতো ব্যবস্থা অবলম্বন করে এসব অন্যায়ের কোনো প্রতিকার সম্ভব হবে না। যে কোনো প্রকৃত কার্যকর উন্নতির জন্য মানুষের মনোজগতে আরো অনেক বড় পরিবর্তন এবং আরো বিরাট জাগরণ অপরিহার্য।

দুই

যেসব জাতির মধ্যে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বর্তমান, সেসব ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র কোনো প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। কেন তা গণতান্ত্রিক নয় তা বোঝার জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যায়। প্রত্যেক গণতন্ত্রীই একথা স্বীকার করেন যে, আইরিশদের

www.pathagar.com

নিজেদের ব্যাপারে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থাকা উচিত, এবং এমন কথা কখনো বলা উচিত নয় যে, তারা যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করে বলেই রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাদের কোনো অভাব-অভিযোগ নেই। কোনো সমাজের নাগরিকদের কোনো অংশের স্বার্থ কিংবা আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি ওই সমাজের অপর সকলের স্বার্থ কিংবা আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক হয়, তাহলে সেই জনসমষ্টির নিজেদের বিষয়সমূহ মীমাংসা করার স্বাধীনতা তাদের থাকতে হবে। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য। আর জাতীয় বা স্থানীয় জনসমষ্টি সম্পর্কে যা সত্য, অর্থনৈতিক জনসমষ্টি— যেমন খনিশ্রমিক কিংবা রেলশ্রমিক প্রভৃতি সম্পর্কেও তা একইভাবে সত্য। সাধারণ নির্বাচনের জাতীয় ব্যবস্থা কোনো অবস্থাতেই এ ধরনের জনসমষ্টির ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারি আমলাদের ক্ষমতা এক বিরাট ও ক্রমবর্ধমান বিপদ। এই বিপদের কারণ, ভোটারদের বেশিরভাগই সাধারণত কোনো বিশেষ প্রশ্নে উৎসাহী হন না। ফলে যেসব আমলা সংখ্যালঘুদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করে দেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁরা হস্তক্ষেপ করেন না। অথচ ভোটারদের অন্তিম নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আমলাদের ওপর অন্য কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণই থাকে না। আমলারা পরোক্ষভাবে নামেমাত্র জনসাধারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু তাঁদের কাজের দ্বারা যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হন, তাঁদের দ্বারা কোনো সময়েই নিয়ন্ত্রিত হন না। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রে জনসাধারণের বিশাল অংশ বিতর্কমূলক বিষয় সম্পর্কে হয় কিছুই জানতে পারবে না, না হয় কিছু জানতে পারলেও বিতর্কমূলক বিষয়ের দ্বারা জাতির যে অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের দিক থেকে না জেনে কেবলমাত্র আমলাদের দিক থেকেই জানবে এবং অপর্যাপ্ত তথ্যাদির ওপর ভিত্তি করেই দ্রুত অভিমত গঠন করে ফেলবে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে হয়তো সময়মতো জনগণের কাছে কিছু তথ্য প্রচারিত হবে, কিন্তু অন্যসব ব্যাপারে তেমনটি ঘটার সম্ভাবনা খুব কম।

বলা যেতে পারে, আমলাদের ক্ষমতা পুঁজিপতিদের ক্ষমতার চেয়ে অনেক কম বিপজ্জনক, কারণ মজুরিজীবীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁদের কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থ নেই। কিন্তু এই যুক্তি মানুষের রাজনৈতিক স্বভাবের নিতান্তই সাধারণ একটি থিওরির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই থিওরি গোঁড়া সমাজতন্ত্রীরা চিরায়ত রাজনৈতিক অর্থনীতি থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং এর অসত্যতা সম্পর্কে প্রচুর প্রমাণ পাবার পরও তাঁরা একে অপরিবর্তিত রাখতে চাইছেন।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বার্থ, এবং এমনকি অর্থনৈতিক শ্রেণিস্বার্থও, কোনোক্রমেই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রবণতা নয়। কোনো ব্যাপারে আমলারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার জন্য সাধারণত তাঁদের বেতনের গায়ে কোনো আঁচড় লাগে না। এ অবস্থায়, তাঁরা যদি সাধারণ সততার লোক হন, তাহলে ধারণা করা যায় যে, জনস্বার্থ সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের মত অনুযায়ী তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবু তাঁদের মতামতের মধ্যে অবশ্যই পক্ষপাতিত্ব থাকবে। ফলে তাঁরা খারাপের দিকে ধাবিত হবেন। আমাদের ভাগ্যকে নিঃশর্তে সরকারি বিভাগের হাতে ছেড়ে দেয়ার পূর্বে এই পক্ষপাতিত্বের সমস্যাটিকে উপলব্ধি করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমেই লক্ষণীয়, কোনো বড় প্রতিষ্ঠানে এবং সর্বোপরি বিরাট রাষ্ট্রে আমলারা এবং আইন প্রণয়নকারীরা যাঁদের শাসন করেন তাঁদের থেকে বহু দূরে অবস্থান করেন, এবং যাঁদের ওপর তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত আরোপ করেন সেসব লোকের জীবনের অবস্থা সম্পর্কে আন্তরিকভাবে তাঁরা মোটেই অবহিত থাকেন না। এর ফলে যদি তাঁরা কষ্ট স্বীকার করে পরিসংখ্যান এবং আইন পরিষদের কার্যবিবরণী থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টাও করেন, তবু যেসব ব্যাপার তাঁদের জানা দরকার সেগুলোর অধিকাংশ সম্পর্কেই তাঁরা অজ্ঞ থেকে যান। একমাত্র যা তাঁরা ভালোভাবে জানতে পারেন তা হল অফিস রুটিন এবং শাসন সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন। তার ফলে তাঁরা একান্তভাবে সুসম ঢালাও নিয়ম-কানুনের একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য অযথা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। আমি একজন ফরাসি শিক্ষামন্ত্রীর কথা শুনেছি যিনি ঘড়ি হাতে নিয়ে বলে দিয়েছিলেন ওই মুহূর্তে ফ্রান্সের কোন বয়সের ছেলেমেয়েরা কোন কোন বিষয় পড়ছে। প্রশাসনের এই-ই হচ্ছে আদর্শ— যে আদর্শ স্বাধীন বিকাশ, নতুন উদ্যোগ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কিংবা নতুন কিছু প্রবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত যে কোনো দূরদর্শী প্রচেষ্টা ইত্যাদির জন্য মারাত্মক। রাজনৈতিক থিওরির পাঠ্যবইতে আলস্যকে একটি প্রবণতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। কারণ মানবস্বভাব সম্পর্কিত যে কোনো সাধারণ বিষয়কে এসব পুস্তকের পক্ষে মর্যাদাহানিকর বলে ধরে নেয়া হয়। তবু আমরা সকলেই জানি, স্বল্পসংখ্যক লোকের কথা বাদ দিলে মানবজাতির আর সকলের বেলায় আলস্য একটি প্রধান প্রবণতা।

দুর্ভাগ্যক্রমে এ ক্ষেত্রে ক্ষমতার সুযোগ আলস্যের প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়, ফলে অলস আমলারা তাদের আলস্যপ্রবণতাকে চরিতার্থ করার উপযোগী ব্যবস্থা প্রবর্তনে বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠেন। এ ধরনের তৎপরতাসম্পন্ন

www.pathagar.com

আমলারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনোকিছুই সহ্য করেন না। যে কোনো কিছু করার আগেই তাঁদের কাছ থেকে নিয়মতান্ত্রিক অনুমোদন নিতে হয়। যে কোনো বিষয় সামনে এলেই তাঁরা কোনো না কোনো উপায়ে তার কিছু না কিছু পরিবর্তন করতে চান, কারণ তারা যে ক্ষমতার মালিক, এ কথাটি তাঁরা নিজেরা অনুভব করেন ও অন্যদের অনুভব করিয়ে আনন্দ পান। এ ধরনের আমলা যদি বুদ্ধিমান হন, তাহলে তিনি সকলের বেলায় প্রয়োগযোগ্য একটিমাত্র কঠোর নিয়ম চিন্তা করে বের করেন, এবং নির্মমভাবে তা সকলের ওপর প্রয়োগ করেন। এর ফলে দেখা দেয় এক প্রকার মারাত্মক স্থূলতা ও জড়তা। এই অবস্থাকে মনে হয়, বংশপরম্পরায় বহু জীবনের ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের দ্বারা সৃষ্ট একটি প্রাচীন নগরীর জীবন্ত সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে তুলনায় একটি আধুনিক চতুষ্কোণ শহরের অন্তঃসারশূন্যতা। স্বাভাবিকভাবে যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তা সবসময়ই উপর থেকে আদেশ দিয়ে প্রবর্তন করা ব্যবস্থার চেয়ে অধিক প্রাণবন্ত। কিন্তু ওই ধরনের তৎপরতাসম্পন্ন আমলা সবসময়ই নিজের হুকুম অনুযায়ী প্রবর্তিত ফিট্‌ফাট ব্যবস্থাকেই স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের আপাতবিশৃঙ্খল ব্যবস্থার চেয়ে উৎকৃষ্ট বলে মনে করে থাকেন।

নিরেট ক্ষমতার অধিকার আরো বেশি ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা জাগায় এবং এ প্রবণতা খুবই বিপজ্জনক; কারণ ক্ষমতার একমাত্র নিশ্চিত প্রমাণ অন্যকে তাঁর ইচ্ছামতো কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারার মধ্যে। গণতন্ত্রের অপরিহার্য তত্ত্ব হল : সকলের মধ্যে ক্ষমতার বিস্তৃতি— যাতে একজনের হাতে বিরাট ক্ষমতার অধিকার থাকার ফলে সৃষ্ট অন্যায়ের পথ বন্ধ হয়। তবে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতার বিস্তৃতি তখনই কার্যকর হয় যখন ভোটারদের সকলেই আলোচ্য প্রশ্ন সম্পর্কে আগ্রহশীল থাকেন। কিন্তু প্রশ্নটি যদি তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পারে তাহলে তাঁরা প্রশাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো চেষ্টাই করেন না। সে অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ক্ষমতাই চলে যায় আমলাদের হাতে।

এ কারণেই গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের দ্বারা বাস্তবায়িত হতে পারে না। যেসব ব্যবস্থায় বিরাট বিরাট ক্ষমতা এমন লোকদের হাতে থাকে যাঁদের ওপর কেবল পার্লামেন্টের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া জনসাধারণের আর কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণই থাকে না, সেসব ব্যবস্থা দ্বারা গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কিত যে কোনো নতুন পর্যবেক্ষণেই দেখা যায়, যাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক সক্রিয়তার প্রচুর শক্তি রয়েছে, তাঁদের

www.pathagar.com

মধ্যে অর্থলিপ্সার চেয়ে ক্ষমতালিপ্সা প্রবল। কোটিপতিরা যে টাকা খরচ করতে পারেন, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকার মালিক হয়েও বিশ্বের অর্থনীতিকে কব্জা করার জন্যই আরো ধন সংগ্রহে তৎপর থাকেন। তাঁরা যে অধিক থেকে অধিকতর সম্পদ করায়ত্ত করার কাজে লিপ্ত থাকেন তার একমাত্র কারণ তাঁরা দুনিয়ার অধিক থেকে অধিকতর অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে চান।[১] ক্ষমতালিপ্সা অনেক রাজনীতিবিদেরই অন্তরের মূল চালিকাশক্তি। যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে সবসময়ই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করা হয়েছে, অথচ যুদ্ধের প্রধান কারণ এই ক্ষমতালিপ্সা। এ কারণে যে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেবল অর্থনৈতিক প্রবণতাকে দমন করতে চাইবে এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার ওপর কোনোরকম হস্তক্ষেপই করবে না, তা দ্বারা জগতের তেমন কোনো উন্নতি হবে বলে মনে হয় না। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের প্রতি সন্দিহান হওয়ার এটিই প্রধান কারণ।

তিন

ক্ষমতা বণ্টনের সমস্যা সম্পদ বণ্টনের সমস্যার চেয়ে অনেক দুরূহ। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় 'চূড়ান্ত' ক্ষমতার প্রতিই দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত রাখা রয়েছে এবং কেবলমাত্র তার প্রতিই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, আর প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক ক্ষমতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রশাসনের গণতন্ত্রায়নের কোনো চেষ্টাই প্রায় করা যায়নি। সরকারি আমলারা নিজেদের আয়, নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদার সুযোগে ধনিকদের পক্ষই অবলম্বন করে থাকেন, এবং এই ধনিক শ্রেণির লোকেরা স্কুল কিংবা কলেজজীবন থেকেই তাঁদের প্রাত্যহিক সঙ্গী। তাঁরা ধনিকদের পক্ষ অবলম্বন করুন আর না-ই করুন, মনে হয় আমরা এখানে যে বিষয়ে আলোচনা করছি তাতে তাঁরা আন্তরিকভাবে প্রগতির অনুকূলে ভূমিকা গ্রহণ করবেন না। সরকারি আমলাদের সম্পর্কে যে কথা প্রযোজ্য, পার্লামেন্টের সদস্যদের সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য; একমাত্র পার্থক্য এই যে, তাঁদেরকে কোনো না কোনো নির্বাচনী এলাকার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এতে অবশ্য শাসকবর্গের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ভণ্ডামিটুকু মাত্র যোগ হয়। হাউস অব কমনসের বারান্দায় যিনি দাঁড়িয়েছেন তিনিই লক্ষ করেছেন, সদস্যেরা কীভাবে চঞ্চল দৃষ্টিতে কৃত্রিম হাসির সঙ্গে 'ভাই' বলে

১. তুলনীয় : G. A Hobosn, *The Evolution of Modern Capitalism.*

www.pathagar.com

নির্বাচকদের হাত ধরেন, আন্তরিকতার ভান করে কানে কানে কথা বলেন, তাঁকে ভেতরের আঙ্গিনায় নিয়ে যান ও তাঁর গোপন সম্মতি আদায় না করা পর্যন্ত তাঁর পেছনে লেগে থাকেন। এ দৃশ্য দেখে যাঁরাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, আইনসভার সদস্য হওয়ার এবং সদস্য থাকার এসবই হল কলাকৌশল, তাঁদের পক্ষে বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে, গণতন্ত্রের বর্তমান যে রূপ, তা কোনোক্রমেই শাসনপদ্ধতির সর্বোৎকৃষ্ট রূপ নয়। দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, অন্তত ইংল্যান্ডের সাধারণ ভোটাররা বিরাজমান অসততা সম্পর্কে সম্পূর্ণই অজ্ঞ। যে ব্যক্তি কোনো প্রকার সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক পদ্ধতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, তাঁকে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে ঘুষ বা তোষামোদের দ্বারা সাধারণত জয় করে ফেলা যায়। যে ব্যক্তি সংস্কারের প্রতি আকৃষ্ট তিনিও প্রায়শ, যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জনকল্যাণ কামনা করেন কিংবা কথা বলার কলাকৌশল বিশেষ জানেন না তাঁর চেয়ে যে ব্যক্তির ফুসফুসের জোর বেশি এবং কায়দা করে কথা বলতে পারেন, তাঁকে বেশি পছন্দ করে ফেলবেন। আর সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাগ্মী যখনই এ ধরনের প্রচেষ্টা দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টি করে একটি শক্তিতে পরিণত হবেন তখনই নিজের প্রভাবকে শাসকচক্রের নিকট বিক্রি করবেন— কখনো প্রকাশ্যে, কখনো-বা গোপনে, আবার কখনো বিপদে পড়ার ভান করে। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে এ ধরনের ঘটনা গণতন্ত্রের স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতিরই অঙ্গীভূত। গণতন্ত্রকে প্রহসনে পর্যবসিত রাখতে না হলে অবশ্যই এর প্রতিবিধান বের করতে হবে।

যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সেগুলোর অধিকাংশের প্রতিই নির্বাচকমণ্ডলীর প্রায় সকলের কোনো প্রত্যক্ষ কিংবা উল্লেখযোগ্য আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। আধুনিক ব্যাপক গণতন্ত্রে অন্যায়ের অন্যতম উৎস এটাই। ওয়েলসের ছেলেমেয়েদের কি স্কুলে ওয়েলস্ ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া উচিত? শিক্ষা কর্তৃপক্ষের আদেশে যাযাবরদের কি ভ্রাম্যমাণ জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা উচিত? খনি শ্রমিকদের কাজের সময় কি দৈনিক আট ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া ন্যায়সঙ্গত? যারা মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা চিকিৎসা করায় গুরুতর অসুখে তাদেরকে কি ডাক্তার ডাকতে বাধ্য করা উচিত? সমাজের কোনো কোনো অংশের নিকট এসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু বিরাট সংখ্যাগুরুর নিকট এগুলো গুরুত্বহীন। এসব বিষয় যদি সংখ্যাগুরুর ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত হয়, তাহলে সংখ্যালঘুর অনেক প্রবল বাসনা সংখ্যাগুরুর ঔদাসীন্য ও খামখেয়ালির ফলে

www.pathagar.com

ব্যর্থ হয়ে যাবে। সংখ্যালঘুরা যদি ভৌগোলিকভাবে সংহত হন এবং যদি তাঁরা ওয়েলস্‌বাসীদের মতো কিংবা খনিশ্রমিকদের মতো কোনো কোনো নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনের নিয়ামক হন, তাহলে নানা কৌশলে পথ করে নেয়ার সঙ্গত সুযোগ তাঁদের থাকে। কিন্তু তাঁরা যদি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকেন এবং রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হন, যেমন যাযাবররা ও খ্রিস্টান মন্ত্রচিকিৎসকরা, তাহলে সংখ্যাগুরু অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিকারের কোনো সুযোগ থাকে না। এমনকি আইরিশদের মতো ভৌগোলিকভাবে সংহত হয়েও তাঁরা তাঁদের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হতে পারেন। কারণ তাঁরা সংখ্যাগুরুর মধ্যে এক প্রকার শত্রুতার মনোভাব কিংবা আধিপত্যের প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলেন। এ ধরনের পরিস্থিতি সকল প্রকার গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী।

সংখ্যাগুরুর স্বেচ্ছাচারিতা অত্যন্ত বাস্তব একটি বিপদ। সংখ্যাগুরুরা সব সময়ই ঠিক হবেন এমন মনে করা ভুল। প্রতিটি নতুন প্রশ্নে সংখ্যাগুরুরা প্রায় সব সময়েই প্রথমে ভুল করেন। শুল্ক প্রভৃতি যেসব ব্যাপারে রাষ্ট্রকে অবশ্যই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে হবে সেসব ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তই সম্ভবত উদ্ভাবনযোগ্য শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু এমন বহুতর প্রশ্ন রয়েছে সেগুলোতে সমরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন নেই। ধর্ম সেগুলোর মধ্যে একটি বলে স্বীকৃত। একটি নির্দিষ্ট নিম্নতম পর্যায়ের পর শিক্ষাও তাই হতে পারে। স্পষ্টত সামরিক চাকরিও তাই হওয়া উচিত। বিভিন্ন জনসমষ্টির বিভিন্নমুখী কাজ যেখানেই অরাজকতার সৃষ্টি করে না, সেখানেই অনুমোদন করা উচিত। অতীত ইতিহাস যাঁরা পর্যালোচনা করেন তাঁরা দেখতে পাবেন, যখনই কোনো নতুন মৌলিক বিষয় উত্থাপিত হয়েছে তখনই সংখ্যাগুরুরা ভুল করেছেন; কারণ তাঁরা সাধারণ প্রচলিত সংস্কার ও অভ্যাস দ্বারা পরিচালিত। মতামত ও রীতিনীতির পরিবর্তন সংখ্যালঘুদের প্রভাবের মাধ্যমেই ক্রমিক প্রগতি সাধিত হয়। খুব বেশি আগের কথা নয়, বৃদ্ধা মহিলাদের ডাইনি গণ্য করে পুড়িয়ে মারা উচিত নয়— এই মত পোষণ করাকে গুরুতর পাপাচার বলে মনে করা হত। এই মত যাঁরা পোষণ করতেন তাঁদেরকে যদি বল প্রয়োগে দমন করে রাখা না হত, তাহলে আমরা আজো সেই কুসংস্কারেই ডুবে থাকতাম। এসব কারণে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, যেসব ক্ষেত্রে সমরূপতা অপরিহার্য নয়, সেসব ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুর ইচ্ছাকে সকলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়।

www.pathagar.com

চার

যেসব অন্যায় ও বিপদের প্রতিকারের কথা আমরা ভেবে আসছি, সেগুলোর প্রতিবিধান করতে হলে প্রয়োজন ক্ষমতার সূক্ষ্ম বণ্টন এবং ফেডারেল সরকার গঠন। ওয়েলস ও আয়ার্ল্যান্ডের মতো যেখানেই জাতীয় চেতনা বিদ্যমান, সেখানেই বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে স্থানীয় সমস্যাসমূহের মীমাংসা করার অনুমোদন থাকা উচিত। কিন্তু কোনো কোনো বিষয় রয়েছে, যেগুলোর ব্যবস্থাপনা স্থানীয় জনসমষ্টির হাতে না দিয়ে বিশেষ বিশেষ শিল্প-কারখানার লোকেদের বা সংগঠনের হাতে দিতে হবে। এই বিভিন্ন শিল্পকারখানার জনসমষ্টি বা সংগঠন বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের নিয়ে গঠিত হতে পারে। প্রাচ্যে মানুষ নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন রকম আইনের অধীন। যেখানে বিশ্বাসের পার্থক্য এত অধিক, সেখানে স্বাধীনতার নিদর্শন স্বরূপ এ ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

কতকগুলো বিষয় একান্তভাবেই ভৌগোলিক, যেমন— গ্যাস ও পানি, রাস্তা, শুল্ক, স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী। এগুলো অবশ্যই এলাকাভিত্তিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। এলাকা কত বড় হবে, তা নির্ভর করে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও ভাবাবেগের ওপর এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রকৃতির ওপর। গ্যাস ও পানির জন্য প্রয়োজন হবে ক্ষুদ্র এলাকার, রাস্তার জন্য অপেক্ষাকৃত বড় এলাকার, আর স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর জন্য সন্তোষজনক এলাকা হবে সমস্তটা পৃথিবী, কারণ এর চেয়ে ছোট এলাকা হলে যুদ্ধ দমন করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু অধিকাংশ অর্থনৈতিক প্রশ্নে এবং যেসব প্রশ্ন একান্তভাবে ব্যক্তিগত মতামতের সঙ্গে জড়িত সেগুলোরও অধিকাংশের বেলায় উপযুক্ত ইউনিট কখনো ভৌগোলিক নয়। রেলপথের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ভৌগোলিক রাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত নয়। কেন উচিত নয় তার কারণ আগেই বলা হয়েছে। রেলপথের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা কিছুসংখ্যক দায়িত্বজ্ঞানহীন পুঁজিপতির হাতে থাকা তো একেবারেই উচিত নয়। একমাত্র সত্যিকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হবে তাই যাতে রেলপথের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার ভার থাকবে তাদেরই হাতে যারা তাতে কাজ করেন। তারাই প্রয়োজন হলে জেনারেল ম্যানেজার ও পরিচালনা পরিষদ নির্বাচন করবেন। মজুরি সম্পর্কিত সকল প্রশ্ন, শ্রমের শর্ত, ট্রেন চালনা ও ট্রেনের উপাদান সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয় এমন একটি সংস্থার হাতে থাকা উচিত যে সংস্থা একমাত্র যথার্থভাবে রেলপথের কাজে নিযুক্ত লোকদের নিকটই দায়ী থাকবে।

www.pathagar.com

খনি, লোহা ও ইস্পাত, কাপড় ও অন্যান্য বৃহৎ শিল্প প্রভৃতির বেলায়ও একই যুক্তি প্রযোজ্য। আমার মনে হয়, ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়ন মতবাদ শ্রম-সংগঠনের দ্বারা শ্রম ও পুঁজিকে একটা শক্তিসাম্যের মধ্যে আনার উদ্দেশ্যে শ্রম ও পুঁজি উভয়কেই স্থায়ী শক্তিরূপে কল্পনা করে ভুল করেছে। আদর্শ হিসেবে এই মতবাদকে আমার কাছে অত্যন্ত দুর্বল মনে হয়। এর পরিবর্তে যে আদর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন তাতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতোই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং বর্তমানে পুঁজিপতিরা যে ক্ষমতা খাটায় তার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটবে। একজন মানুষ একটি রাষ্ট্রের সরকারে কাজ করতে গিয়ে যেমন সে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাঁর নিজের মতামত প্রকাশ করার অধিকার লাভ করেন, তেমনি একজন মানুষ যখন একটি রেলপথে কাজ করেন তখন রেলপথের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সম্পর্কেও তাঁর নিজের মতামত প্রকাশ করার অধিকার থাকা উচিত। মালিক বা নিয়োগকারীর হাতে ব্যবসাক্ষেত্রের উদ্যোগ গ্রহণের সমস্ত সুযোগ একান্তভাবে কেন্দ্রীভূত থাকা এক বিরাট অন্যায়। এর দ্বারা ব্যবসা সংক্রান্ত বৃহত্তর সমস্যাবলিতে কর্মচারীদের যে ন্যায়সঙ্গত আগ্রহ থাকে তা নিঃশেষ করে দেয়া হয়।

ফরাসি সিন্ডিকালিস্টরাই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে শিল্পকারখানার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে উৎকৃষ্টতর সমাধান বলে মত প্রচার করেন। কিন্তু তাঁদের মত অনুযায়ী, শিল্পকারখানাগুলোরও প্রায় বর্তমান সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের মতোই স্বাধীনতা থাকার কথা ছিল। কিন্তু তাতে বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে অবস্থা, তার চেয়ে অধিক শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হত না। যে কোনো জনসমষ্টির বেলায় অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বৈদেশিক রাজনীতির মধ্যে একটা মোটা ভেদরেখা টানা যায়। যেসব জনসমষ্টি রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত, তাদের প্রত্যেকেরই অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থাকা উচিত; কিন্তু যেসব বিষয় বাইরের জগতে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে, সেগুলোতে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থাকা উচিত নয়। দুটো জনসমষ্টির উভয়টিই যদি পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে তাহলে সেখানে প্রকাশ্য কিংবা গোপন বলপ্রয়োগের বিপদকে কোনোভাবেই রোধ করা যাবে না। যেখানেই সম্ভব হয় সেখানেই বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো জনসমষ্টির সম্পর্ক কোনো নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যের পারস্পরিক এই সম্পর্ক পরিচালনার জন্যই

www.pathagar.com

সরকারের প্রয়োজন। কোনো পণ্য যারা উৎপাদন করে— শ্রমের সময়, শিল্পকারখানার মোট আয়ের বণ্টন এবং শিল্প-ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়ের মীমাংসা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাঁদের মতামত প্রদানের বিষয়ের মীমাংসা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাঁদের মতামত প্রদানের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে তাঁদের স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়; কারণ মূল্যের বিষয়টি তাঁদের সঙ্গে সমাজের বাকি অংশের সম্পর্ক রয়েছে। মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে যদি তাঁদের নামেমাত্র স্বাধীনতাও থাকে তাহলেও দড়িটানাটানির প্রতিযোগিতার মতো একটা কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বদা লেগে থাকবে। আর যেসব শিল্প জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিতান্ত আশু প্রয়োজনের, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেগুলো সবসময়ই অন্যায় সুযোগ ভোগ করবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্কের বেলায় যেমন, তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বলপ্রয়োগ মোটেই প্রশংসনীয় নয়। সবচেয়ে কম বলপ্রয়োগ করে সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা অর্জন করার আন্তর্জাতিক নীতি হবে : রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি জনসমষ্টির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নিশ্চিত করা, এবং বিভিন্ন জনসমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের বেলায় একটি পক্ষপাতমুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা। নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষকেও অবশ্যই গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে হবে। তবে যদি সম্ভব হয় তাহলে উক্ত পক্ষপাতমুক্ত কর্তৃপক্ষের মধ্যে, যেসব জনসমষ্টির সমস্যা জড়িত সেগুলোর চেয়ে বৃহত্তর কোনো নির্বাচনী এলাকা থেকে, প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করা উচিত। আন্তর্জাতিক বিষয়ে পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য জাতির প্রতিনিধিত্বশীল একটি সংস্থাই হবে উপযুক্ত সংস্থা।

এ ধরনের কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অসঙ্গত ব্যাপ্তিকে রোধ করার জন্য যা বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয় তা হল, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত জনসমষ্টিগুলো তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকবে এবং তাদের স্বাধীনতার ওপর যে কোনো অবৈধ হস্তক্ষেপকে রাজনৈতিক উপায়ে প্রতিরোধ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। প্রত্যেক জনসমষ্টির নিজস্ব প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ থাকবে এবং সেই প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ জনসমষ্টির নিকট দায়ী থাকবে। এ ধরনের ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রে সহ্য করা হয় না। ফলে তাতে কোনো জনসমষ্টির অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ এমন লোকদের নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয় যাঁরা সে জনসমষ্টির কাছে দায়ী নন, কিংবা তাঁদের প্রয়োজন সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত নন। এতে স্বেচ্ছাচারের পথ উন্মুক্ত হয় এবং স্বাধীন উদ্যোগের মৃত্যু ঘটে। এসব বিপদ দূর হয় এমন ব্যবস্থায় যাতে, লুণ্ঠনমূলক নয় এমন যে কোনো

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে যে কোনো জনসমষ্টি একত্র হতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করতে পারে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গির্জাসমূহ হচ্ছে একটা দৃষ্টান্ত। তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জিত হয়েছিল শত শত বৎসরের সশস্ত্র সংগ্রাম ও নির্যাতনের মোকাবিলার মধ্য দিয়ে। আশা করা যায়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরো কম ভয়াবহ সংগ্রামের দ্বারা সে ফলাফল লাভ করা যাবে। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা যাই আসুক না কেন, আমি বিশ্বাস করি, স্বাধীনতার গুরুত্ব এক ক্ষেত্রে যেমন বিরাট বলে স্বীকৃত হয়েছে, অন্য ক্ষেত্রেও তেমনই বিরাট বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ

আইন ও শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজ টিকতে পারে না, আর নতুনের প্রবর্তকদের বলিষ্ঠ উদ্যোগ ছাড়া সমাজের অগ্রগতির ধারা অচল হয়ে পড়ে। অথচ আইন-শৃঙ্খলা সবসময়ই নতুনের প্রবর্তনের শত্রু, আর নতুনের প্রবর্তকেরাও প্রায় সবসময়ই কমবেশি অরাজক। যাঁদের মন পুনরায় বর্বরতায় নিপতিত হবার ভয়ে ভীত, তাঁরা আইন-শৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব বেশি দেবেন; আর যাঁরা সভ্যতার অগ্রগতির আশার দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রকাশের প্রয়োজন সম্পর্কে বেশি সচেতন হবেন।

দুই রকম মনোভাবেরই প্রয়োজন রয়েছে; যেখানে যেটি মঙ্গলজনক সেখানে সেটির অনুমোদনেই বিজ্ঞতার পরিচয়। কিন্তু যাঁরা আইন-শৃঙ্খলার পক্ষপাতী, 'প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানাদি' তাঁদের অনুকূলে শক্তি জোগায়; তাই তাঁদের জন্য রক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজন নেই। যাঁরা নতুনের উদ্ভাবক ও প্রবর্তক, তাঁদের অস্তিত্বরক্ষা ও কাজ করাতেই যত বিপদ। প্রত্যেক প্রজন্মই বিশ্বাস করে, এই সমস্যা অতীতের ব্যাপার; কিন্তু প্রত্যেক প্রজন্মই কেবল 'অতীতের' নবপ্রবর্তকদের প্রতিই সহনশীল। যাঁরা সমকালীন, তাঁরা একইভাবে নির্যাতিত। সমকালীনদের বেলায় সহনশীলতার নীতি অনুসৃত হয়েছে, এমন কথা প্রায় কখনো শোনা যায় না।

ওয়েস্টারমার্ক বলেছেন, "আদিম সমাজে দেখা যায়, প্রচলিত প্রথাসমূহ কেবল নৈতিক বিধান নয়, বরং সেগুলোই একমাত্র নৈতিক বিধান যার বাইরে নৈতিক বিষয় সম্পর্কে মানুষ কখনো চিন্তাও করেনি।" কোনো মানুষেরই ব্যক্তিগত বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত নয়— এই হেগেলীয় নির্দেশের সঙ্গে বর্বর মানুষকে সম্পূর্ণ একমত দেখা যায়। টিনেভেলির তামিল উপজাতীয় লোকদের সম্পর্কে বিবৃত নিচের মন্তব্যটিকে একটি আদর্শ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায় : "তাদের মধ্যে একা একা কোনো ব্যক্তি কদাচিৎ কোনো নতুন মত

www.pathagar.com

কিংবা কোনো নতুন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে। ভালোমন্দ যাই তারা করুক, দলকে অনুসরণ করেই করে— তাই তাদের রীতি। তারা চিন্তা করে যৌথবদ্ধভাবে।"[১] আমাদের মধ্যে যাঁরা প্রতিবেশীদের থেকে ভিন্ন ধারায় কখনো সামান্যতম চিন্তা কিংবা কাজও করেনি, তাঁরা নিজেদের সঙ্গে বর্বর মানুষদের পার্থক্যের কথা ভেবে নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করবেন। কিন্তু যাঁরা একবারও প্রকৃতপক্ষে নতুন কিছু চিন্তা করেছেন কিংবা নতুন পদ্ধতিতে কোনো কাজ করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা এটা না ভেবেই পারবেন না যে, তাঁদের চারপাশের পরিচিত মানুষগুলোও টিনেভেলির তামিল জাতীয় লোকদের চেয়ে মোটেই ভিন্ন প্রকৃতির নন।

সমাজতন্ত্রের প্রভাবে সাম্প্রতিককালের প্রগতিশীল সব মতবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠেছে। সংস্কারকদের মনে স্বাধীনতার ধারণা এখন 'অবাধ বাণিজ্য', 'ম্যানচেস্টার স্কুল' আর নারী ও শিশুদের প্রতি প্রতারণা করার ধারণার সঙ্গে একার্থক হয়ে পড়েছে। ভদ্রলোকদের ভাষায় যাকে 'স্বাধীন প্রতিযোগিতা' বলা হয়, এসবের সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকেই। স্বাধীনতার নামে পরিচালিত এইসব কার্যকলাপ ছিল সম্পূর্ণই অন্যায়, এবং এগুলোর ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছিল জরুরি। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় যেসব অন্যায়ের অস্তিত্ব এখনো রয়েছে, সেগুলোর ওপর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার প্রয়োজন অপরিসীম। যেসব বিষয়ের সঙ্গে জনগণের অর্থনৈতিক জীবনের সম্পর্ক আছে— যেমন বণ্টন ও উৎপাদনের ব্যবস্থা— সেগুলোতে আরো বেশি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দরকার। সেসব ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ কম হওয়া তো উচিত নয়ই, বরং কত বেশি হওয়া উচিত— তা এখনো নিশ্চিত করে বলা যায় না।

আরো একটি ব্যাপারে অরাজকতার পরিবর্তে অবিলম্বে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তা হল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বর্তমানে প্রত্যেকটি সার্বভৌম রাষ্ট্র স্বতন্ত্রভাবে যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী, কার্যক্ষেত্রে তা যুদ্ধ ঘোষণার স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু নয়। যদি যুদ্ধ কখনো বন্ধ করতে হয়, তাহলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বেলায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের এই চূড়ান্ত স্বাধীনতা খর্ব করতে হবে।

কিন্তু বস্তুগত ভোগ-দখলের সীমা যখন আমরা অতিক্রম করি, তখন দেখতে পাই, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সব যুক্তিই অচল।

---

১. The Origin and Devolopment of the Moral Ideas প্রথম খণ্ড ; দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১১১

www.pathagar.com

প্রথমেই ধর্মের কথা বলা যায়। ধর্মকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বাইরের বিষয় বলে চিহ্নিত করা হয়। কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ আইন মেনে চলেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি খ্রিস্টান, না মুসলমান, না ইহুদি, তা নিয়ে রাষ্ট্রের মাথা ঘামাবার কোনো দরকার পড়ে না। অবশ্য আইন এমন হওয়া দরকার যাতে সব ধর্মের লোকেই তা মেনে চলতে সক্ষম হয়। কিন্তু এখানেও একটা সীমারেখা আছে। কোনো সভ্য রাষ্ট্রই নরবলির ধর্মীয় দাবি সহ্য করবে না। দেশীয় প্রথা-পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ না করার নির্দিষ্ট নীতি থাকা সত্ত্বেও ইংরেজরা ভারতে সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটিয়েছে। যে কোনো ইউরোপীয় জাতিই তাই করত। ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে আমরা যতই তত্ত্ব দাঁড় করাই না কেন, এ ধরনের প্রথা যে বন্ধ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে 'কার্যকর' কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

এসব ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ হয় বাইরের উচ্চতর সভ্যতার দিক থেকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা দেখা যায় এবং যা আরো কৌতুকজনক, তা হল : যেসব লোক উচ্চতর বিশ্বাস ও উন্নততর প্রতিষ্ঠানের পথে অগ্রসর হতে উৎসুক, স্বাধীন রাষ্ট্রও তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আচার, সংস্কার ইত্যাদির পক্ষ অবলম্বন করে।

ওয়েস্টারমার্ক বলেছেন, "নিউ সাউথ ওয়েলসে আদি-অস্ট্রেলীয় উপজাতির প্রত্যেক লোকের প্রথম সন্তানকে তাদের গোত্রের লোকেরা 'ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে' ভক্ষণ করত। চীনের একটা স্থানীয় বিবরণ অনুযায়ী, খাই-মুঃদের এলাকায় জীবিত জ্যেষ্ঠ সন্তানকে জীবন্ত হত্যা করে ভক্ষণ করার রীতি প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় কোনো কোনো উপজাতির লোকেরা প্রথম সন্তানকে প্রায়ই সূর্যের উদ্দেশে বলি দিয়ে থাকে। লা মোয়েন দা মরগুস-এর বর্ণনা অনুসারে, ফ্লোরিডার রেড ইন্ডিয়ানরা তাদের প্রথম সন্তানকে গোত্রপতির উদ্দেশে বলি দিত।"[১]

পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে এ ধরনের উদাহরণের উল্লেখ আছে।

এসব প্রথার সদৃশ কোনো প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নেই। ফ্লোরিডার প্রথম সন্তানকে যখন বলা হত, রাজার এবং দেশের প্রয়োজনে তাকে প্রাণ দিতে হবে তখন তা ছিল নিতান্তই একটা ভুল কাজ, এবং আমাদের বেলায় এ ধরনের ভুল কাজ কখনো হয় না। কিন্তু এসব কুসংস্কার কীভাবে লোপ পেল তা অনুসন্ধান করা খুবই কৌতূহলের ব্যাপার— বিশেষত সেসব ক্ষেত্রে যেখানে বিদেশি বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়নি, যেমন খাই-মুঃদের ক্ষেত্রে।

১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৯

www.pathagar.com

খাই-মুঃদের ওপর বিদেশি বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়েছিল, এমন মনে করার কোনো কারণ পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে বলা যায় : কোনো কোনো মাতা-পিতা মাতৃ-পিতৃসুলভ স্বার্থপরতাবশত স্নেহে কাতর হয়ে এমন সন্দেহের বশবর্তী হতেন যে, প্রথম সন্তানকে যদি বাঁচিয়ে রাখা হয় তাহলে সূর্য যে সত্য সত্যই রুষ্ট হবে, তার প্রমাণ কী? এ ধরনের যুক্তিপরায়ণতাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করা হত; কারণ, ধারণা প্রচলিত ছিল যে, এর ফলে দেশের ফসল নষ্ট হবে। কয়েক পুরুষ ধরে নিতান্ত স্বল্পসংখ্যক লোক গোপনে এই রকম ধারণা হৃদয়ে লালন করতেন— কিন্তু সেই ধারণা অনুযায়ী কাজ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হত না। অবশেষে, লুকিয়ে অথবা পালিয়ে গিয়ে কিছুসংখ্যক পিতা-মাতা তাঁদের সন্তানকে বলির হাত থেকে রক্ষা করতেন। এসব লোককে সর্বসাধারণের স্বার্থবিরোধী ও একান্ত আপন সুখের জন্য সমাজকে বিপদে ফেলতে উদ্যোগী বলে মনে করা হত। কিন্তু ক্রমে দেখা যেতে থাকে যে, দেশের অবস্থা আগের মতোই থাকে এবং ফসলও পূর্ববর্তী বছরসমূহের তুলনায় খারাপ হয় না। তারপর যদি কোনো শিশুকে গোত্রপতি কৃষি কিংবা অন্য কোনো জাতীয়-প্রয়োজনের কাজে উৎসর্গ করার জন্য পছন্দ করতেন তাহলে তাকে কাল্পনিক গল্পের সাহায্যে উৎসর্গের প্রয়োজন বিশ্বাস করানো হত। শিশু তার নিজের রুচি ও ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হবার বয়সে পৌঁছে নিজের পছন্দমতো পেশা গ্রহণের অধিকার অর্জন করেছে বহু প্রজন্ম পরে। এতকাল ধরে বংশপরম্পরায় শিশুদের কেবল মনে করিয়ে দেয়া হত যে, নিতান্ত করুণাবশতই তাদের বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়েছে। আর তাদেরকে তখন বাঁচতে হত রাষ্ট্রের প্রতি এমন অনেক কর্তব্যের ছায়াতলে যেগুলো সম্পূর্ণই কাল্পনিক।

যেসব পিতামাতা সন্তান উৎসর্গ করার প্রয়োজনকে প্রথম অবিশ্বাস করল, তারাই হল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার অসমন্বয়জাত অসুবিধার উদাহরণ। কর্তৃপক্ষ প্রচার করত, জাতির মঙ্গলের জন্য শিশু-বলি আবশ্যক; সেজন্য তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এ ব্যাপারে জোর দিতে তারা বাধ্য ছিল। অপরদিকে পিতা-মাতা এই প্রথাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে সন্তানকে বাঁচাবার জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বনে সাধ্যমতো সচেষ্ট ছিল। এই রকম অবস্থায় দুই পক্ষেরই কী করা কর্তব্য?

অবিশ্বাসী পিতামাতার কর্তব্য স্পষ্ট : যে কোনো উপায় অবলম্বন করে শিশুকে তাঁরা বাঁচাবেন, সকল সময় বিসর্জনের অর্থহীনতার কথা প্রচার করবেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে আইনের নির্যাতন সহ্য করে এগুবেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের

www.pathagar.com

কর্তব্য এতটা স্পষ্ট নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ এই বিশ্বাসে অটল যে, প্রথম সন্তানের সর্বজনীন বিসর্জন অপরিহার্য ততক্ষণ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ, যাঁরা এই বিশ্বাসের অবসান ঘটাতে চান, তাঁদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে বাধ্য। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদি বিবেকসম্পন্ন হয়, তাহলে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিকে পরীক্ষা করে দেখবে, এবং সর্বাগ্রে তাদের যুক্তির নির্ভুলতার 'সম্ভাবনা'কে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হবে। কর্তৃপক্ষ নিজের অন্তরের মধ্যে অনুসন্ধান করে দেখবে, সন্তানের প্রতি ঘৃণা অথবা নিষ্ঠুরতার আনন্দের সঙ্গে তাদের বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি-না। তারা স্মরণ করবে যে, খাই-মুঃদের অতীত ইতিহাসে এমনসব বিশ্বাসের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যেগুলোকে এখন সকলেই মিথ্যা বলে জানলেও এককালে সেগুলোর সত্যতাকে অস্বীকার করার ফলে অনেককে জীবন দিতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা, চিন্তা করবে যে, বংশপরম্পরায় চলে আসা ভুল ধারণাসমূহ যদিও ব্যাপকভাবে প্রচলিত, তবু নতুন বিশ্বাসগুলো সেগুলোর চেয়ে সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী না হলে নতুনগুলো কোনো সময়েই স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, নতুন বিশ্বাস হয় একটি অগ্রগতি, নাহয় তা প্রচলিত বিশ্বাসের তুলনায় সুবিধাজনক। এসব বিবেচনার ফলে তারা শাস্তিপ্রদান করতে গিয়ে ইতস্তত বোধ করবে।

দুই

অতীত কালের এবং অসভ্য জাতিসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রশ্নাতীতভাবে বোঝা যায় যে, উপজাতি বা জাতিসমূহের আচারকেন্দ্রিক সব বিশ্বাস সর্বৈব মিথ্যা। আমাদের নিজেদের দেশ-কালের বিভিন্ন আচারগত বিশ্বাস ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হলেও সেগুলো সম্পর্কে কিছু না কিছু সন্দেহপরায়ণ হয়ে ওঠা মোটেই অসুবিধাজনক নয়। ধর্মীয় অপরাধ তদন্তের জন্য রোমান ক্যাথলিক যাজকদের দ্বারা গঠিত বিচারসভার যে বিচারক মানুষকে খুঁটিতে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মানুষের প্রাণ সংহার করতেন, তাঁর সকল বিশ্বাস যদি নির্ভুল হয়ে থাকে তাহলে তাঁর কাজ সত্যিকার মনুষ্যত্বেরই পরিচায়ক হয়েছে। কিন্তু যদি সে বিশ্বাসের কোথাও কোনো ভুল থেকে থাকে, তবে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় একটা নিষ্ঠুরতাই প্রদর্শন করেছেন। এসব ব্যাপারে যে নীতি মোটামুটি ভালোভাবে প্রযোজ্য তা হল, প্রথাগত যেসব বিশ্বাস সম্পূর্ণ সত্য না

www.pathagar.com

হলে সেই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত কাজ মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়, সেগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন না করা। সাধারণ ইংরেজ যদি বলতে না পারত, 'ব্রিটেন সমুদ্রের অধীশ্বর', কিংবা সাধারণ জার্মান যদি বলতে না পারত, 'সবার ওপরে জার্মানি' তাহলে তাদের কাছে এই পৃথিবীটা অত্যন্ত খারাপ জায়গা বলে মনে হত। এসব বিশ্বাসের জন্য তারা ইউরোপীয় সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। বিশ্বাসগুলো যদি মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাদের কাজ দুঃখজনক।

এসবের পটভূমিতে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, চিন্তার ও চিন্তা প্রকাশের কিংবা প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করার পথে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতাই থাকা উচিত নয়। উদারপন্থী চিন্তাবিদদের মধ্যে আগে এটি ছিল চিন্তার সাধারণ ভিত্তি। অবশ্য কোনো সভ্য দেশেই তা কখনো বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু বর্তমানে ইউরোপের সর্বত্রই এ বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যার ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার কিংবা কোনো কোনো চিন্তা প্রকাশ করার জন্য মানুষকে কারাগারে যেতে বা অনাহারে নিপতিত হতে হচ্ছে। এজন্যই বিষয়টি পুনরায় উল্লেখযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ আজ চিন্তার স্বাধীনতার কথা ভুলে গিয়েছে বলেই এর উল্লেখ করতে আমি বাধ্য হচ্ছি। অন্যথায় এই বহুল আলোচিত সুস্পষ্ট বিষয়টির আলোচনায় অগ্রসর হতে আমি সঙ্কোচ বোধ করতাম। প্রকৃত প্রস্তাবে এ বিষয়ের পুনরালোচনা আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পূর্ণ সত্যে পৌঁছার ক্ষমতা মরণশীল মানুষের নেই; কিন্তু পূর্ণ সত্যের দিকে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নয়। প্রত্যেক দেশে প্রতিটি সাধারণ প্রয়োজনের ব্যাপারেই এক-এক সময় এক-একটি পূর্বপ্রাপ্ত মত প্রচলিত থাকে। যাঁরা কোনো ব্যাপারে বিশেষ কিছু চিন্তা করেন না, তাঁরা এই গতানুগতিক মতকে জীবনযাত্রার পদ্ধতি হিসেবে সহজে গ্রহণ করে নেন এবং তা অনুসরণ করেন। এই পূর্বপ্রাপ্ত মত সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠালে নানা কারণে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

এসব কারণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল : গতানুগতিক ধারায় চলার সহজাত প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তি যূথবদ্ধভাবে বসবাসকারী সকল প্রাণীর মধ্যেই বর্তমান। এর ফলে তারা তাদের দলের পরিপন্থী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীকে হত্যা করে।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কারণ হল : যেসব বিশ্বাস অবলম্বন করে আমরা জীবনযাপন করি, সেগুলো সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার ফলে সৃষ্ট

www.pathagar.com

নিরাপত্তাহীনতার বোধ। কোনো সাধারণ লোকের কাছে অবিকৃতভাবে যিনিই বার্কলির দর্শন ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন, তিনিই এই বোধ থেকে উদ্ভূত ক্ষোভ দেখেছেন। প্রথমবার শুনে বার্কলির দর্শন থেকে একজন সাধারণ মানুষ যে ধারণা লাভ করেন, তা হল, এই অস্বস্তিকর সংশয় যে, কোনো জিনিসই কঠিন অবস্থাতে নেই, ফলে চেয়ারের উপর বসা কিংবা ঘরের ভিত আমাদেরকে বহন করবে বলে আশা করা একটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সন্দেহ যেহেতু পীড়াদায়ক তাই তা বিরক্তির উৎপাদক। অবশ্য সম্পূর্ণ বিতর্কটাকেই যাঁরা অর্থহীন বলে মনে করেন, তাঁদের কথা আলাদা। বার্কলির দর্শনের এই প্রতিক্রিয়ার মতোই, যা সত্য বলে মেনে নেয়া হয়েছে তার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত ভেঙে পড়ে এবং একটা হতবুদ্ধিকর ভীতির অবস্থা সৃষ্টি হয়।

নতুন মতকে মানুষের অপছন্দ করার তৃতীয় কারণ : কায়েমি স্বার্থ পুরনো সব বিশ্বাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। জিওরদানো ব্রুনো থেকে ডারউইন পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে গির্জার দীর্ঘকালের যুদ্ধের অন্যতম কারণ এটাই। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে দূর অতীতে যে ভয়ঙ্কর ভীতি ছিল, তার কারণও সম্পূর্ণরূপে এটাই। কিন্তু যাঁরা সবকিছুর পেছনেই অর্থনৈতিক মতলব অনুসন্ধান করেন, তাঁদের মতে এটা ধারণা করা ভুল হবে যে, চিন্তার ক্ষেত্রে নতুনের বিরুদ্ধে ক্রোধ উদ্রেকের প্রধান উৎস একমাত্র কায়েমি স্বার্থ। কেবল এটাই যদি প্রধান উৎস হত তাহলে বুদ্ধিবৃত্তির অগ্রগতি আরো অনেক দ্রুত হত।

গতানুগতিকতার সহজাত প্রবৃত্তি, অনিশ্চয়তার ভয় এবং কায়েমি স্বার্থ— এই সবগুলোই নতুন মত গ্রহণের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে সক্রিয়। অধিকন্তু কোনো নতুন মত অন্যদের গ্রহণ করানোর চেয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা বেশি কঠিন। সারা জীবন চেষ্টা করেও প্রায় কেউই প্রকৃত মৌলিক কিছু উদ্ভাবন করতে পারেন না।

এসব অসুবিধার কথা বিচার করলে মনে হয় না যে, কোনো সমাজে কখনো প্রচলিত মত ও বিশ্বাসের ঘোরতর বিরোধী মত খুব বেশি দেখা দিতে পারে। আধুনিক সভ্য সমাজে জীবনের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তনশীল। ফলে পরিবর্তনের সঙ্গে সার্থকভাবে খাপ খাইয়ে চলা দরকার। এ অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তিতে ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও অনুরূপ দ্রুত পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন অপরিহার্য। সেজন্যই নতুন বিশ্বাসের প্রকাশ এবং তার সমর্থনে জ্ঞান বিস্তারের উদ্যোগকে ধ্বংস না করে বরং তাকে উৎসাহিত করা উচিত। কিন্তু ঠিক এর বিপরীত ঘটনাই বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটে চলছে। শিশুকাল থেকেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মনকে

www.pathagar.com

গতানুগতিক এবং বন্ধ্যা করে ফেলার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আর দুর্ঘটনাক্রমে যদি স্বাধীন কোনো চিন্তাশক্তির স্ফুলিঙ্গ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তার হতভাগ্য মালিককে মনে করা হয় অপ্রকৃতিস্থ ও বিপজ্জনক। আর শান্তির সময় সে অপদস্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার এবং যুদ্ধের সময় কারাবাসের অথবা বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুবরণ করার যোগ্য হয় মাত্র। তথাপি, এসব মানুষই মানবজাতির অতীতের প্রধান ত্রাণকর্তা বলে পরিচিত হয়েছেন, এবং এই ধরনের লোকেরাই মৃত্যুর পর সবচেয়ে বেশি সম্মানেরও অধিকারী হয়েছেন।

চিন্তার ও মতামতের সমস্তটা জগৎই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী; যাঁরা অতীতের বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত, তাঁদের মতে এই জগৎ যতদূর সম্ভব স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির উপযোগী হওয়া উচিত। শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য রাষ্ট্রের চাপ যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু তাদেরকে একই ছাঁচে শিক্ষা দিয়ে সুসমতার চরম সীমায় পৌঁছানোর চেষ্টা অযৌক্তিক। শিক্ষার ও মানসজীবনের জন্য যা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তা হল ব্যক্তিগত উদ্যোগ। রাষ্ট্রের কাজের শুরু এবং শেষ— দুটোই হওয়া উচিত 'কোনো না কোনো প্রকার' শিক্ষার চেষ্টার দ্বারা, এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন করা উচিত যার ফলে ব্যক্তির মানসিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় এবং সরকারি কুসংস্কারগুলো শিক্ষার্থীর মনে বদ্ধমূল হবার সুযোগ না পায়।

তিন

কার্যক্ষেত্রে নিছক মতামতের প্রশ্নের চেয়ে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন বেশি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। দুর্বৃত্তেরা তাদের প্রয়োজনে হত্যা করাকে সহজভাবেই কর্তব্য মনে করে, কিন্তু সরকার তা মেনে নেয় না। বিবেকের নামে যাঁরা আপত্তি তোলেন তাঁরাও নিজেদের বিচার অনুযায়ী সৎভাবেই মৃত্যুদণ্ডকে অনুচিত মনে করেন, অথচ সরকার এটাও মেনে নেয় না। হত্যা করার বিশেষ অধিকার রাষ্ট্রের আছে; রাষ্ট্রীয় আদেশ ছাড়া হত্যা করা অপরাধ; আবার রাষ্ট্রের দ্বারা হত্যা করার জন্য আদিষ্ট হয়ে হত্যা না করাও অপরাধ। চুরি করা সম্পর্কেও একই কথা— যদি তা বৃহদাকারে না হয়, কিংবা কোনো ধনবান লোকে না করে। চোর-ডাকাতরাই প্রতিবেশীদের সঙ্গে আচরণে বলপ্রয়োগ করে থাকে; তাই আমরা মোটামুটি স্থির করতে পারি, উদ্দেশ্য যতই বিবেকপ্রসূত হোক না কেন, ব্যক্তিগত বলপ্রয়োগ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ থাকা উচিত। কিন্তু এই নীতি

www.pathagar.com

অনুযায়ী মানুষ যদি কোনো কারণে বলপ্রয়োগকে ন্যায়সঙ্গত বলে বিশ্বাস করতে না পারে তা হলেও রাষ্ট্রের আদেশে বলপ্রয়োগে বাধ্য হবে— এ নীতির ন্যায্যতা প্রতিপন্ন হয় না। বিবেকের নামে যাঁরা আপত্তি তোলেন তাঁদের শাস্তিকে স্পষ্টতই ব্যক্তিস্বাধীনতার বৈধ সীমার মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার অমর্যাদা বলে মনে হয়।

প্রশ্নাতীতভাবে ধরে নেয়া হয় যে, কতকগুলো যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার শাস্তি বিধানের অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে। কেউই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করেন না যে, মরমন সম্প্রদায়ের লোকেরা আন্তরিকভাবেই বহু বিবাহকে একটি বাঞ্ছনীয় প্রথা বলে মনে করত। তথাপি যুক্তরাষ্ট্র এর আইনানুগ স্বীকৃতি দেয়নি, এবং সম্ভবত অন্য যে কোনো খ্রিস্টান দেশও এ ব্যাপারে একই পথ অবলম্বন করত। তবু এই প্রথার নিষিদ্ধকরণকে আমি বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করি না। বহুবিবাহ পৃথিবীর অনেক দেশেই আইনের দ্বারা অনুমোদিত; কিন্তু গোত্রপতি ও রাজ-রাজড়াদের ছাড়া খুব বেশি লোকে তা করে না। ইউরোপীয়দের বিশ্বাসমতো এই প্রথা যদি অবাঞ্ছিত হত তাহলে মরমনরা সম্ভবত অল্পদিনের মধ্যেই তা ত্যাগ করত— কেবল স্বল্পসংখ্যক উচ্চ অবস্থানের লোক ছাড়া। অপর দিকে যদি এটা একটা পরীক্ষা হিসেবে সাফল্য অর্জন করত, তাহলে পৃথিবীর মানুষ এমন একটা জ্ঞান লাভ করত যা এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত। আমার মনে হয়, এসব ব্যাপারে আইনের হস্তক্ষেপ কেবল তখনই হওয়া উচিত যখন তা কোনো ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হয় এবং সেই ক্ষতি ওই ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাধিত হয়।

সুপ্রজননবাদীরা যত যুক্তিই দেখান না কেন, স্পষ্টই বোঝা যায়, রাষ্ট্র কর্তৃক স্ত্রী কিংবা স্বামী নির্বাচনের পদ্ধতি নারী-পুরুষ কেউই সহ্য করবে না। পরিষ্কার বোঝা যায়, এ ব্যাপারে প্রচলিত জনমতই ঠিক, এবং তা ঠিক হওয়ার কারণ এই নয় যে, মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে স্ত্রী বা স্বামী বাছাই করে; বরং তার কারণ, তাদের নিজেদের পছন্দমতো বিয়ে আরোপিত বিয়ের চেয়ে ভালো। বিয়ের ব্যাপারে যা প্রযোজ্য, ব্যবসা এবং পেশা নির্বাচনের বেলায়ও তা প্রযোজ্য হওয়া উচিত। যদিও পেশা নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো কোনো লোকের বিশেষ কোনো পছন্দ নেই, তথাপি বেশিরভাগ লোকই কোনো কোনো পেশাকে অন্যান্য পেশার চেয়ে বেশি পছন্দ করেন। এঁরা যদি সরকারি কর্তৃপক্ষের দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়ে নিজেদের পছন্দমতো পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারতেন তাহলে রাষ্ট্রের উপকারী নাগরিক হতে পারতেন।

যে ব্যক্তির কোনো বিশেষ ধরনের কাজের প্রতি প্রবল আকর্ষণ রয়েছে, সে ব্যক্তি স্বভাবতই একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ, এবং সম্ভবত তিনি খুব সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষ নন। যাঁদের মধ্যে এ ধরনের প্রবল আগ্রহ বর্তমান, ব্যক্তি হিসেবে তাঁরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জোয়ান অফ আর্ক এবং ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এ ধরনের অনুভূতিবশতই গতানুগতিকতাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। মাৎসিনির মতো অপ্রিয় বিষয়ের সংস্কারক ও আন্দোলনকারীরাও এই শ্রেণিভুক্ত, এবং অনেক বৈজ্ঞানিকও এ শ্রেণিতে পড়েন। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পছন্দের প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি মূল্য দাবি করে— এমনকি যদি তার পেছনে কোনো রকম সুস্পষ্ট যৌক্তিকতা দেখা না যায় তবু। চিত্তের কোনো বিশেষ বৃত্তির প্রতি আনুগত্য মোটেই কোনো ক্ষতির কারণ হবে না, বরং তাতে প্রচুর মঙ্গলের সম্ভাবনা রয়েছে। বাস্তব অসুবিধা হল, কামনা-বাসনা থেকে এই বৃত্তিকে পৃথকভাবে চিনতে পারা; কারণ এ ধরনের বৃত্তি আর কামনা-বাসনা উভয়েরই প্রকাশ কার্যক্ষেত্রে প্রায় একই রকম। এমন অনেক তরুণ রয়েছে যারা লেখক হতে আকাঙ্ক্ষী, অথচ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বই লেখার কোনো হৃদয়বৃত্তিগত তাড়না তাদের মধ্যে নেই। অনেকে চিত্রকর হতে চায়, অথচ তাদের মধ্যে ছবি আঁকার কোনো প্রবৃত্তিগত তাড়না অনুপস্থিত। কিন্তু সামান্য অভিজ্ঞতাতেই প্রকৃত প্রবৃত্তিগত তাড়না আর কৃত্রিম ইচ্ছার মধ্যকার পার্থক্য ধরা পড়ে যায়। আর কৃত্রিম ইচ্ছাকে কিছু সময়ের জন্য কাজ করতে দেয়া একটি আন্তরিক আবেগকে বঞ্চিত করার চেয়ে কম ক্ষতিকর। তথাপি সাধারণ মানুষ প্রায় সবসময়ই প্রবৃত্তিগত আন্তরিক তাড়নাকে বাধা দিতে চায়, কারণ এটাকে তারা অরাজক ও অযৌক্তিক বলে মনে করে, আর এই প্রবৃত্তিও প্রায়ই নিজের সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই কোনো স্পষ্ট পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয় না।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে যা বিশেষভাবে সত্য, প্রচুর জীবনীশক্তি সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কেও তা আংশিকভাবে সত্য। যুবকদের মধ্যে সাধারণত কোনো কোনো বিশেষ কাজের প্রতি বেশি আগ্রহ লক্ষ করা যায়— যা প্রথম পর্যায়ে খুব নির্দিষ্ট থাকে না, কিন্তু শিক্ষা ও সুযোগের প্রভাবে ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। ফল লাভের জন্য কোনো কাজ করার পেছনে যে বাসনা ক্রিয়াশীল থাকে তা থেকে কোনো কাজের প্রতি অনুরাগবশত সেই কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রত্যক্ষ বৃত্তিগত তাড়নাকে পৃথক করে দেখতে হবে। একজন তরুণের জীবনে বিশেষ কাজের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তিগত তাড়না না থাকলেও ওই কাজের বিরাট সাফল্যের পুরস্কার অর্জনের বাসনা থাকতে পারে। কিন্তু যাঁরা সত্য-সত্যই বিরাট কিছু অর্জন করতে সমর্থ হন, তাঁরা যদি পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা করেনও, তবু তাঁদের স্বভাবে এমন একটা কিছু থাকে যা তাঁদেরকে এমন কাজ

www.pathagar.com

পছন্দ করতে তাদের প্রণোদিত করে, যা তাঁদের আকাঙ্ক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অবশ্যই তাঁদের করা কর্তব্য। এ মনোবৃত্তিকে যদি শিল্পীমনোবৃত্তি বলি, তাহলে ব্যক্তিজীবনে এর মূল্য অপরিসীম, এবং প্রায় সকল সময় পৃথিবীর পক্ষেও তা অমূল্য। নিজের মধ্যে এবং অন্যের মধ্যে এই জিনিসটিকে মর্যাদাদানের দ্বারাই পৃথিবীর দশ ভাগের নয় ভাগ মহৎ জীবন গঠিত হয়। প্রায় সকল মানুষের মধ্যে এই বৃত্তি কোমল অবস্থায় থাকে এবং সহজেই তা বিনাশপ্রাপ্ত কিংবা বাধাপ্রাপ্ত হয়। পিতামাতা ও শিক্ষকরা প্রায় সবসময়ই মানবচিত্তের এই বৃত্তিটির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, আর আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তরুণ-তরুণীদের অন্তঃস্থিত এই বৃত্তির শেষ ধ্বংসাবশেষটুকুকেও নিংড়ে নেয়। এর ফলে মানুষ ব্যক্তিসত্তা বজায় রাখতে এবং সহজাত অহংবোধের জন্মগত অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। মানুষ হয়ে পড়ে যন্ত্রজাত দ্রব্যের মতো ছাঁচে গড়া, নিতান্ত পোষমানা, আমলা ও ড্রিল সার্জেন্টদের জন্য সুবিধাজনক; তখন তাঁদেরকে পরিসংখ্যানে ট্যাবুলেট করতে গেলেও আর ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। এটাই হল স্বাধীনতার অভাব থেকে উদ্ভূত মূল অভিশাপ। এই অভিশাপ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত বেড়েই চলছে।

মানুষের কাম্য অনেক এবং বাসনা বিভিন্নমুখী। প্রশংসা, ভালোবাসা, ক্ষমতা, নিরাপত্তা, আরাম-আয়েস, কর্মশক্তি প্রকাশের সুযোগ প্রভৃতি মানুষের সবচেয়ে সাধারণ কামনা। কিন্তু এইসব কামনার বিমূর্ত উল্লেখের দ্বারা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য তা মোটেই স্পষ্ট হয় না। আমি যখনই কোনো চিড়িয়াখানায় যাই, লক্ষ করি, সারসের সমস্ত গতিবিধিতে এমন কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো টিয়া কিংবা উটপাখির গতিবিধি থেকে আলাদা। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য কী, তা কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবু আমরা বুঝতে পারি, কোনো প্রাণী যা-ই করুক না কেন— তা ওই প্রাণীর পক্ষেই স্বাভাবিক। এই অবর্ণনীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই প্রাণীর ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় এবং এর ফলেই কোনো প্রাণীর কার্যকলাপ অবলোকন করে আমরা আনন্দ পাই। ব্যক্তিবিশেষ যদি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিংবা সরকারি শাসনযন্ত্রের দ্বারা নিষ্পেষিত না হয়, তাহলে তার মধ্যেও একই ধরনের ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়, তার মধ্যেও লক্ষ করা যায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা তার একান্ত নিজের— যা ছাড়া কোনো নারী-পুরুষই কোনো বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী হতে পারে না, কিংবা আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বটিই শিল্পীর প্রিয়— তা তিনি চিত্রশিল্পীই হোন কিংবা লেখকই হোন। শিল্পীদের এবং যে কোনো

www.pathagar.com

ধরনের সৃজনক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে এই প্রবণতা সাধারণ মানুষদের তুলনায় অনেক বেশি। যে সমাজে ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা দুর্ঘটনাক্রমে মানুষের এই গুণটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয় সে সমাজ অচিরেই প্রাণহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। সে সমাজ এমন একটি গতানুগতিকতার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয় যে, তার উন্নতির আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না এবং তার অস্তিত্বের পেছনেও আর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। মানবচিত্তের যেসব বৃত্তি ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করে, সেগুলোকে রক্ষা করা এবং শক্তিশালী করাই সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

চার

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে এখন আমরা কতকগুলো সাধারণ নীতিতে পৌঁছতে পারি।

মানুষের প্রবৃত্তি বা তাড়নাসমূহের বৃহত্তর অংশকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায় : এক. স্বত্বাধিকারমূলক, এবং দুই. সৃজনমূলক বা গঠনমূলক। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের তাড়নাসমূহের পোশাকি বা শরীরী রূপ মাত্র। সেগুলোকেও অন্তর্নিহিত তাড়না বিচারে মোটামুটি শ্রেণিভুক্ত করা যায়। সম্পত্তি হচ্ছে মালিকানালিপ্সার শরীরী রূপ; আর বিজ্ঞান ও শিল্পকলা সৃজনশীল বৃত্তির সবচেয়ে সুষ্ঠু শরীরী রূপ। স্বত্বলিপ্সার প্রকাশ, হয় আত্মরক্ষামূলক, নাহয় আক্রমণাত্মক; এর উদ্দেশ্য, হয় লুণ্ঠনকারীর হাত থেকে সম্পদ রক্ষা করা, নাহয় বর্তমান অধিকারীর কাছ থেকে সম্পদ নিজের অধিকারে ছিনিয়ে আনা। উভয় ক্ষেত্রেই এর মূলে বিরাজ করে অন্যের প্রতি একটা শত্রুতামূলক মনোভাব। আত্মরক্ষামূলক স্বত্বলিপ্সাকে সবসময় ন্যায়সঙ্গত মনে করলে এবং আক্রমণাত্মক স্বত্বলিপ্সাকে সবসময় দূষণীয় মনে করলে ভুল করা হবে; কারণ 'প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানাদি' যেহেতু সম্পূর্ণ অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য এর বিপরীতটাই অর্থাৎ আক্রমণাত্মক স্বত্বলিপ্সাই বরং ন্যায়সঙ্গত হতে পারে । আর সাধারণ বিচারে দুটির একটিকেও ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না।

স্বত্বলিপ্সার জন্যই ব্যক্তির কার্যকলাপের ওপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দেয়। বলপ্রয়োগের দ্বারা কতকগুলো কল্যাণ অর্জন করা কিংবা রক্ষা করা সম্ভব, কিন্তু বেশিরভাগই তা দ্বারা পারা যায় না। বলপ্রয়োগের দ্বারা একজন মহিলাকে পত্নীরূপে লাভ করা যেতে পারে, যেমন রোমানরা স্যাবাইন মেয়েদের

www.pathagar.com

লাভ করেছিল; কিন্তু এভাবে কোনো নারীর ভালোবাসা লাভ করা যায় না। রোমানরা যে স্যাবাইন মেয়েদের ভালোবাসা কামনা করেছিল, এমন কোনো প্রমাণ অবশ্য নেই। যাদের মধ্যে স্বত্ব লাভের বাসনা প্রবল, তারা আসলে বলপ্রয়োগের দ্বারা যা লাভ করা যায়, তার প্রতিই আকৃষ্ট। সকল প্রকার বস্তু-সম্পদই এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এসবের বেলায় যদি স্বাধীনতার ওপর কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে শক্তিমানেরাই ধনী হয়, আর দুর্বলেরা হয়ে পড়ে দরিদ্র। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় আইনে যে ধরনের আংশিক নিয়ন্ত্রণ বর্তমান, তাতে ধূর্ত লোকেরা ধনী আর ভালো লোকেরা দরিদ্র হয়। কারণ এ ব্যবস্থায় কিছু লোককে ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহারের এমন সুযোগ দেওয়া হয় যা কোনো ন্যায়নীতি বা যুক্তির ওপর ভিত্তিশীল নয়, ভিত্তিশীল কতকগুলো গতানুগতিক নিয়মের ওপর যেগুলোর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক।

যেসব জিনিসের সঙ্গে স্বত্বাধিকার ও বলপ্রয়োগের সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলোর বেলায় নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতার ফলে অরাজকতা ও অন্যায় অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিপর্যায়ে হত্যা, লুণ্ঠন, প্রতারণা প্রভৃতির অধিকার এখন আর নেই; কিন্তু রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা এখনও রয়েছে এবং দেশপ্রেমের নামে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে। আদালতে আইনসঙ্গত বলে অনুমোদিত হতে পারে এমন কোনো কোনো আকস্মিক প্রয়োজনের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও নিজের উদ্যোগে ব্যক্তি বা রাষ্ট্র কারো কোনো প্রকার বলপ্রয়োগের অধিকার থাকা উচিত নয়। এর কারণ, একজনের বিরুদ্ধে আর একজনের বলপ্রয়োগ সবসময়ই দুইজনের জন্যই ক্ষতিকর হয়, এবং তা মেনে নেওয়া যেতে পারে একমাত্র তখনই, যখন তার ফলে কোনো বড় কল্যাণ লাভ করা যায়। বাস্তবে পৃথিবীতে যে পরিমাণ বলপ্রয়োগ ঘটে, তা হ্রাস করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ থাকা উচিত। এই কর্তৃপক্ষ হবে, বাস্তব ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ না করে পারা যায় না— এমন বলের একত্রীকরণের কেন্দ্র এবং প্রাথমিকভাবে তার কাজ হবে ব্যক্তিগত পর্যায়ের বলপ্রয়োগকে রোধ করা। বলপ্রয়োগ তখনই 'ব্যক্তিগত' পর্যায়ের হয় যখন তা কোনো নিরপেক্ষ লোকহিতকর কর্তৃপক্ষের দ্বারা কোনো নিয়ম অনুযায়ী জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে না হয় বরং কোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের দ্বারা অথবা তার বন্ধু বা সহযোগীদের দ্বারা হয়।

ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক যে শাসনব্যবস্থায় আমরা বাস করছি, তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের বলপ্রয়োগকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রায় কিছুই করছে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যখন কোনো ব্যক্তি কিছু জমির মালিক হন, তখন

www.pathagar.com

তিনি তাঁর জমিতে অনধিকার প্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করতে পারেন; কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশকারীদের বলপ্রয়োগের কোনো অধিকার নেই। এটা স্পষ্ট যে, জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য অনধিকার প্রবেশের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যদি ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, তাহলে রাষ্ট্রের এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে, ব্যক্তি জনস্বার্থে যেটুকু জমির অধিকার লাভের যোগ্য তার চেয়ে বেশি তার অধিকারে না থাকে এবং জমির উৎপাদনের যে অংশ তার অধিকারে আসে তা যেন পরিশ্রমের মূল্য হিসেবে তার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্যের চেয়ে বেশি না হয়। সম্ভবত একমাত্র জমির রাষ্ট্রীয় মালিকানা দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। বর্তমানে জমি ও পুঁজির মালিকেরা অর্থনৈতিক চাপের দ্বারা বিত্তহীনদের ওপর এক ধরনের বলপ্রয়োগ করতে পারে। এ ধরনের বলপ্রয়োগ আইনের দ্বারা অনুমোদিত; অথচ ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের বলপ্রয়োগ বেআইনি। এ রকম অবস্থা অন্যায়ের ওপর ভিত্তিশীল এবং এতে ব্যক্তিপর্যায়ের বলপ্রয়োগ যতটা কমানো সম্ভব ততটা কমানো যায় না।

স্বত্বলিপ্সা সম্পর্কিত সকল বিষয় এবং তা থেকে উৎসারিত বলপ্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত একটি নিরপেক্ষ লোকহিতকর কর্তৃপক্ষের দ্বারা। এই ব্যবস্থা স্বাধীনতার স্বার্থে যতখানি, ন্যায়বিচারের স্বার্থেও ঠিক ততখানিই প্রয়োজনীয়। একটি জাতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রই হবে এই কর্তৃপক্ষ। আর বিভিন্ন জাতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি বর্তমান অরাজকতার অবসান ঘটাতে হয়, তাহলে তার জন্য প্রয়োজন একটি আন্তর্জাতিক পরিষদ।

কিন্তু মানুষের স্বত্বলিপ্সাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার মূল উদ্দেশ্য সবসময়ই হওয়া উচিত স্বাধীনতার বিকাশ, এবং তা করতে হবে ব্যক্তিগত পর্যায়ের অনাচার দমনের দ্বারা ও সৃজনশীল বৃত্তির মুক্তি ঘটিয়ে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা যদি মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল বেশি করার উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে তা এমনভাবে কার্যকর করা উচিত যাতে ব্যক্তিগত বলপ্রয়োগের বাইরে সব ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রকাশের স্বাধীনতা বজায় থাকে। এ ব্যাপারে সব সরকারই মর্মান্তিক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, এবং অবস্থার উন্নতির কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

সৃজনশীল বৃত্তিসমূহ স্বত্বাধিকারলিপ্সার মতো নয়। সেগুলোর প্রকৃতি এমন নয় যে, তাতে একজনের লাভে অপরজনের ক্ষতি হয়। যে ব্যক্তি কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সাধন করেন অথবা একটি কবিতা লেখেন, তিনি যেমন নিজেকে তেমনি অন্যদেরকেও সমৃদ্ধ করেন। জ্ঞানের বা শুভকামনার যে কোনো

www.pathagar.com

বিকাশ কেবল তার প্রকৃত অধিকারীরই মঙ্গল ঘটায় না, বরং যাঁরা তার দ্বারা প্রভাবিত হন তাঁদের সকলের মঙ্গল ঘটায়। যাঁরা জীবনের আনন্দকে অনুভব করেন, তাঁরা নিজেরা যেমন আনন্দিত হন, তেমনি অন্যদেরও আনন্দের কারণ ঘটান। বলপ্রয়োগের দ্বারা এমন শুভকর বা আনন্দকর কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না— যদিও তা দ্বারা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে। এগুলোর বেলায় কোনো বণ্টনমূলক ন্যায়নীতির প্রশ্ন নেই, কারণ এগুলোতে প্রত্যেকের লাভই সকলের লাভ। এসব কারণে মানুষের জীবনের সৃজনশীল দিকটা সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত থাকা উচিত— যাতে তা স্ফূর্তি ও পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে। ব্যক্তিজীবনের এ দিকটির জন্য রাষ্ট্রের একমাত্র করণীয় হল, আত্মপ্রকাশের ও চর্চার সুযোগদানের জন্য যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করা।

প্রত্যেক জীবনেরই একটি অংশ সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং আর একটি অংশ ব্যক্তিগত উদ্যোগ দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের এবং সৃজনশীল চিন্তাবিদদের মতো গুরুত্বসম্পন্ন লোকদের বেলায়, জীবনের যে অংশ ব্যক্তিগত উদ্যোগ দ্বারা পরিচালিত তাই প্রধান। জীবনের এই অংশটিকে কেবলমাত্র তখনই নিয়ন্ত্রণ করা উচিত যখন তা আক্রমণাত্মক বা পরজীবী হয়ে ওঠে; অন্যথায় এর বিকাশের ও শক্তিবৃদ্ধির জন্যই সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত। সব মানুষ একইভাবে একই রকম চিন্তা করবেন, মানুষকে এমনভাবে তৈরি করা কখনো শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে, প্রত্যেকটি মানুষের স্বকীয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া। জীবিকার উপায় নির্বাচনের ব্যাপারে প্রত্যেক তরুণ-তরুণীরই যতদূর সম্ভব নিজের আকর্ষণ অনুযায়ী পেশা নির্বাচনের সুযোগ থাকা উচিত। যদি কারো কাছে ধনার্জনে ব্যস্ত থাকা আকর্ষণীয় মনে না হয়, তাহলে তার কম কাজ করে কম বেতন নেওয়ার ও অবসর সময় নিজের পছন্দমতো ব্যয় করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। চিন্তার স্বাধীনতার কিংবা জ্ঞান-বিস্তারের ওপর যে কোনো রকম নিয়ন্ত্রণই অবশ্যই চরম নিন্দার যোগ্য।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক— উভয় ক্ষেত্রেই বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠান হল আধুনিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। এসব প্রতিষ্ঠান সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, এবং এগুলো সব সময়ই চিন্তা ও কর্মের মৌলিকতাকে ধ্বংস করার কাজে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের উচিত, যেসব ক্ষেত্রে কোনো অরাজকতা কিংবা প্রবল সংঘর্ষের সৃষ্টি না হয় সেসব ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব বেশি স্বাধীনতার সুযোগ দেওয়া। মালিকানা ও বলপ্রয়োগ— রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের এই

www.pathagar.com

বৈধ বিষয়গুলো ছাড়া ব্যক্তিজীবনের আর কোনো বিষয় সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করা তাদের উচিত নয়। এসব প্রতিষ্ঠানের উচিত, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা যতদূর সম্ভব ব্যক্তি ও ছোট ছোট দলের হাতে ছেড়ে দেওয়া। যদি তা না করা হয় তাহলে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা অতিরিক্ত ক্ষমতা খাটানোর অভ্যাসের মধ্য দিয়ে নিশ্চিতভাবে অত্যাচারী হয়ে উঠবে এবং সুযোগমতো এমন অনধিকার হস্তক্ষেপে লিপ্ত হবে যা ব্যক্তিগত উদ্যোগকে ধ্বংস করে দেবে।

বর্তমান জগৎ যে সমস্যার সম্মুখীন তা হল, প্রতিষ্ঠানের আকার ও পরিধির পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সম্পর্ক স্থাপন। এই সমস্যার সমাধান না করলে ব্যক্তিমানুষেরা দিন দিন নিস্পৃহ ও শক্তিহীন হয়ে পড়বে, এবং তাদের ওপর যে অবস্থাই চাপিয়ে দেয়া হবে তার কাছেই তারা নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মসমর্পণ করবে। যে সমাজে ব্যক্তিমানুষ এই ধরনের অবস্থায় নিপতিত, সে সমাজ কখনো প্রগতিশীল হতে পারে না এবং বিশ্বের মানসিক বা আত্মিক সম্পদভাণ্ডারে কোনো অবদান রাখতে পারে না। এসব অর্জিত হতে পারে একমাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উদ্যোগ প্রকাশে উৎসাহ দানের মাধ্যমে। ব্যক্তির বৈধ স্বাধীনতার ওপর কর্তৃপক্ষ যখন অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করে, তখন যাঁরা তাতে বাধা দেন, সমাজের চোখে তাঁদের কাজের মূল্য যত সামান্যই হোক, তাঁদের সেই কাজের দ্বারা সমাজই লাভবান হয়। অতীতের বেলায় সকলেই একথা স্বীকার করেন; কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যতের বেলায়ও একথা একটুও কম সত্য নয়।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদ

রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাম্য হল : রাষ্ট্রস্থিত প্রত্যেক গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীনতা এবং বাহ্য ব্যাপারে— অর্থাৎ বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে— গোষ্ঠীগত বলপ্রয়োগের পরিবর্তে আইন। ঠিক তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কাম্য হল : প্রত্যেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীনতা এবং বাহ্য ব্যাপারে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে আইনের অস্তিত্ব। তবে রাষ্ট্রের মধ্যকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর বেলায় গোষ্ঠীসমূহের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার ওপরই বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে, কারণ এই জিনিসটিরই অভাব এখন; মধ্যযুগের অবসানের সময় থেকে আইনের নিয়ন্ত্রণ মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রের বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ উভয় ব্যাপারেই স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু কোনো আইন বা কেন্দ্রীয় শাসনের অস্তিত্ব নেই। ইউরোপে এখন আমরা যে পর্যায়ে পৌঁছেছি, তা গোলাপের যুদ্ধের সময়কার আমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়; তখনও কলহমত্ত ব্যারনরা তাঁদের ওপর অর্পিত শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালনে তাদের ব্যর্থতা রাজার শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। তাই দেখা যাচ্ছে, দুই ক্ষেত্রেই লক্ষ্য যদিও এক, তবু তা অর্জনের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের সীমা পরিবর্তিত হয়ে যতটা সম্ভব জাতির সীমার সঙ্গে এক হয়ে না যাবে, ততদিন পর্যন্ত ভালো কোনো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্ভব হবে না।

কিন্তু জাতি বলতে আমরা কী বুঝাতে চাই, তা স্পষ্ট করা সহজ নয়। আইরিশরা কি একটি জাতি? স্বায়ত্তশাসনবাদীরা বলবেন, হ্যাঁ; এককেন্দ্রিক শাসনবাদীরা বলবেন, না। আলস্টারবাসীরা কি একটি জাতি? এককেন্দ্রিক শাসনবাদীরা বলবেন হ্যাঁ; স্বায়ত্তশাসনবাদীরা বলবেন, না। এসব ক্ষেত্রে কোনো

www.pathagar.com

জনসমষ্টিকে জাতি বলা উচিত কি না, তা দল-মত সাপেক্ষ। একজন জার্মান বলবেন রাশিয়ার পোলান্ডবাসীরা একটি জাতি; কিন্তু প্রাশিয়ার পোলান্ডবাসীদের কথা উঠলে তাঁরা অবশ্যই তাকে প্রাশিয়ার একটি অংশ বলবেন। এমন অনেক অধ্যাপককেই ভাড়া করে আনা সম্ভব— যাঁরা নরগোষ্ঠী, ভাষা, ইতিহাস ইত্যাদির যুক্তি দেখিয়ে কোনো বিতর্কমূলক জনসমষ্টিকে তাঁদের প্রভুদের অভিপ্রায়মতো জাতি বলে, কিংবা জাতি নয় বলে রায় দিতে পারবেন। এসব বিতর্ক থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রথমে অবশ্যই আমাদের চেষ্টা করতে হবে জাতির সংজ্ঞা নির্ধারণের।

যদিও ভাষাগত ঐক্য এবং অভিন্ন ঐতিহাসিক বিকাশ জাতি গঠনে সাহায্য করে, তবু কেবল এগুলোর ওপর নির্ভর করেই জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ করা উচিত নয়। নরগোষ্ঠী, ধর্ম এবং ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও সুইজারল্যান্ডের জনগণ একটি জাতি। ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড যদিও গৃহযুদ্ধের সময়ে এক জাতি ছিল না, তবু এখন তারা এক জাতি। প্রবল বিবাদের সময় ক্রমওয়েলের উক্তি দ্বারা দেখানো হয় যে, তিনি স্কটল্যান্ডবাসীদের রাজ্যভুক্ত হবার চেয়ে বরং রাজপন্থীদের আধিপত্য স্বীকার করতেও রাজি ছিলেন। গ্রেট ব্রিটেন এক জাতি হবার আগেই এক রাষ্ট্র ছিল, অপর দিকে জার্মানি এক রাষ্ট্র হবার আগে থেকেই এক জাতি।

জাতি গঠনের উপাদান হচ্ছে একটি ভাবাবেগ ও একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তি : ভাবাবেগ হচ্ছে সাদৃশ্যবোধের এবং প্রবৃত্তি হচ্ছে একই গোষ্ঠী বা দলভুক্ত থাকার। একদল মেষের অথবা যে কোনো যূথচারী প্রাণীর একসঙ্গে বাস করার পেছনে যে মনোবৃত্তি কাজ করে, মানুষের জাতীয়তাবোধের পেছনেও সেই মনোবৃত্তিই আরো ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল। জাতির সঙ্গে যে ভাবাবেগ যুক্ত তা পারিবারিক অনুভূতির একটি মৃদু অথচ পরিব্যাপ্ত রূপ। ইংল্যান্ডের বাইরে কিছুদিন কাটিয়ে যদি আমরা ইংল্যান্ডে ফিরে আসি, তাহলে পরিচিত পরিমণ্ডলে ঘরোয়া পরিবেশে আমরা একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আবহ অনুভব করি। আর তখন এটা বিশ্বাস করাও সহজ হয়ে ওঠে যে, ইংরেজরা মোটামুটি ভালো কিন্তু বিদেশিরা অনেক খারাপ ও দুরভিসন্ধিপূর্ণ।

এ ধরনের অনুভূতি বিরাজ করলে একটি জাতিকে একটি রাষ্ট্রে সংগঠিত করা সহজ হয়। এ অবস্থায় সাধারণ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা মোটেই দুরূহ হয় না। আমরা অনুভব করি : সরকার আমাদেরই এবং আমরা নিজেরা শাসক হলে আমাদের আইন-কানুন যেমন হত, এখনো সেগুলো মোটামুটি তেমনি রয়েছে। একটি জাতির সদস্যদের অচেতন মনে একটি সাধারণ উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

সাধনের সহজাত মনোবৃত্তি সর্বদা সক্রিয় থাকে। যখন যুদ্ধ কিংবা ওই জাতীয় কোনো বিপদ দেখা দেয়, তখনই ওই বৃত্তির প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তিই তার দেশের সরকারের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে চায়, সে-ই একটি মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। অথচ বিদেশি সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে অনুরূপ কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দেয় না। নিজস্ব সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়েও প্রত্যেকেই কমবেশি সচেতনভাবে এমন একটি আশা হৃদয়ে পোষণ করে যে, সরকার একদিন তার চিন্তা গ্রহণ করবেই। কিন্তু বিদেশি সরকারের বিরুদ্ধাচরণের বেলায় এ ধরনের কোনো আশার সুযোগই থাকে না। যেভাবেই এই সমষ্টিচেতনার উদ্ভব হোক না কেন, এই চেতনাই জাতির জন্ম দেয়, এবং এ জন্যই জাতির সীমা এবং রাষ্ট্রের সীমা এক করার গুরুত্ব এত বেশি।

জাতীয় ভাবাবেগ একটি বাস্তব সত্য, এবং সব প্রতিষ্ঠানেরই তা বিবেচনা করা উচিত। এই চেতনাকে যখন উপেক্ষা করা হয়, তখনই এর তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং তা বিবাদের উৎসে পরিণত হয়। আগ্রাসী পর্যায়ে গিয়ে না পৌঁছা পর্যন্ত এর স্বাধীন বিকাশ ঘটতে দিলেই এতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু মূলত এ অনুভূতিটা প্রশংসাযোগ্য বা মঙ্গলজনক নয়। মানবজাতির ক্ষুদ্র একটি অংশে মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতি সীমাবদ্ধ থাকুক— এই নীতি বুদ্ধির পরিচায়ক নয়, কাম্যও নয়। মানুষের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যে বৈচিত্র্য থাকা ভালো। এতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধরনের উৎকর্ষ অর্জনে সমর্থ হয়। কিন্তু জাতীয়তাবোধের মধ্যে সবসময়ই বিদেশিদের প্রতি একটি সুপ্ত কিংবা স্পষ্ট শত্রুতামূলক মনোভাবের প্রকাশ থাকে। যতদূর দেখা যায়, বাইরের শত্রুতামূলক চাপ থেকে মুক্ত জাতির মধ্যে জাতীয় চেতনা বজায় থাকে না।

আর দলগত প্রেরণা থেকে উদ্ভূত নৈতিক বিবেচনার সীমা সঙ্কীর্ণ, এবং তা প্রায় সবসময়েই ক্ষতিকর। এতে মানুষ কেবল নিজের দলের স্বার্থে যা ভালো তাকেই ভালো বলে স্বীকার করে; আর কোনো জিনিস যদি সমগ্র মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও তার নিজের দলের স্বার্থহানি ঘটায়, তাহলেই সে তাকে খারাপ বলে নির্দেশ করে। এই দলীয় নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যুদ্ধের সময়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পায় এবং তখন তা মানুষের সাধারণ চিন্তাকেও সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যদিও জার্মানির পরাজয়কে প্রায় সব ইংরেজই পৃথিবীর জন্য মঙ্গলজনক বলে ভাবে, তবু তারা প্রায় সকলেই জার্মানদের সম্মানের চোখে দেখে; কারণ তারা ভাবে, জার্মানরা নিজেদের দেশের জন্য যুদ্ধ করছে। দলীয়

www.pathagar.com

নৈতিক বিচারপদ্ধতির চেয়ে উন্নততর নৈতিক বিচারপদ্ধতি দ্বারাও যে মানুষের কার্যকলাপ পরিচালিত হতে পারে, এটা তাদের ধারণাতেই আসে না।

কোনো ব্যক্তি যখন নিজের চিন্তাকে অন্য জাতি অপেক্ষা নিজের জাতির প্রতিই বেশি নিয়োজিত রাখেন, তখন সাধারণভাবে ঠিকই করেন। কারণ তাঁর কার্যকলাপ দ্বারা তাঁরা নিজের জাতিই প্রভাবিত হতে পারে বেশি। কিন্তু যুদ্ধ কিংবা ওই ধরনের অন্য কোনো সঙ্কট— যা তাঁর নিজের জাতির পক্ষে যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য জাতির পক্ষেও ততটুকুই গুরুত্বপূর্ণ— দেখা দেয়, তখন তাঁর উচিত সর্বজনীন কল্যাণের দিকে লক্ষ রাখা। সে অবস্থায় যদি কেউ তাঁর দৃষ্টিকে কেবল নিজের দলের কিংবা নিজের জাতির স্বার্থ অথবা সম্ভাব্য স্বার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন, তা হলে তা অন্যায়।

যতদিন পর্যন্ত জাতীয় অনুভূতি বর্তমান, ততদিন অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রত্যেক জাতির স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের জনসাধারণ যদি সরকারকে শত্রু বলে ভাবে, তাহলে সে সরকার একমাত্র বলপ্রয়োগ ও নির্যাতনের উপায় অবলম্বন করেই টিকে থাকতে পারে। আর সরকার যদি জাতির ভেতর থেকে গঠিত না হয়, তাহলে জনসাধারণ সেই সরকারকে শত্রু ভাবতে বাধ্য। যেখানে বিভিন্ন জাতির মানুষ একই এলাকায় একসঙ্গে বাস করে সেখানে এ জিনিসটি অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে দেখা দিতে পারে— যেমন বলকানের কোনো কোনো অংশে দেখা যায়। সুয়েজ খাল বা পানামা খালের মতো যেসব স্থানের ভৌগোলিক কারণে বিশেষ আন্তর্জাতিক গুরুত্ব রয়েছে, সেগুলো নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এসব স্থানের অধিবাসীদের নিতান্ত স্থানীয় আকাঙ্ক্ষা বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে উৎসর্গ করতে হতে পারে। তথাপি প্রায় সব সভ্য মানবসম্প্রদায়ের বেলায়ই রাষ্ট্রের সীমা আর জাতির সীমা প্রায় এক হবে।

এ নীতি দ্বারা অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের অথবা পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থের সংঘাত মীমাংসার কোনো উপায় পাওয়া যায় না। বর্তমানে প্রত্যেক শক্তিশালী রাষ্ট্রই চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব দাবি করে, এবং এই দাবি কেবল তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেই নয়, বাইরের ব্যাপারেও করে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের একই রকম পূর্ণ সার্বভৌমত্বের দাবির ফলে পারস্পরিক সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এইসব সংঘাতের মীমাংসা বর্তমানে একমাত্র যুদ্ধ কিংবা কূটনীতির দ্বারাই হতে পারে। অবশ্য কূটনীতিও প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধেরই হুমকি মাত্র। ব্যক্তির চূড়ান্ত স্বাতন্ত্র্যের দাবির পেছনেও এর অতিরিক্ত কোনো যুক্তি নেই। বর্তমানে কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সার্বভৌমত্বের দাবি হলে পারস্পরিক

www.pathagar.com

বহির্দেশীয় ব্যাপারসমূহের পরিচালনা কেবল বলপ্রয়োগের দ্বারা সাধনেরই দাবি। এর অর্থ : যখন দুটো জাতির কিংবা বিভিন্ন জাতির দুটো সমষ্টির স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধ বাধে তখন তার সমাধান সম্পূর্ণরূপে তাদের মধ্যে যেটি বেশি শক্তিশালী তার হাতেই ছেড়ে দেয়া। এটা আদিম অরাজকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ হল সেই অবস্থা যাকে হব্‌স মানবজাতির 'প্রাকৃত অবস্থা' বলে নির্দেশ করেছেন— যেখানে 'সকলের বিরুদ্ধে সকলের যুদ্ধ' চলে।

যতদিন পর্যন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রই পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের প্রশ্নে নিজেদের পরিপূর্ণ সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করতে রাজি না হবে এবং যতদিন পর্যন্ত এসব ব্যাপারে সমস্যা সমাধানের ভার কোনো আন্তর্জাতিক সরকারের[১] হাতে ন্যস্ত করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে নিরাপদ শান্তি দেখা দেবে না এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানও হবে না। আন্তর্জাতিক সরকারকে একই সঙ্গে আইনের প্রণয়নকারী ও প্রয়োগকারী হতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত কতিপয় আইনের ওপর নির্ভর করে সমস্যার সমাধানের জন্য একটি হ্যাগ ট্রাইবুন্যালের ব্যবস্থা মোটেই যথেষ্ট নয়। এমন একটি প্রতিষ্ঠান দরকার যা আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের এবং ন্যায়সঙ্গত কারণে প্রয়োজন হলে কোনো রাষ্ট্রের সীমা পরিবর্তনের ক্ষমতারও অধিকারী হবে। শান্তির বন্ধুরা ভুল করবেন যদি তাঁরা প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানাদিকেই অযথা গৌরবান্বিত করেন। অনেক জাতি বিকাশমান, আবার অনেক জাতি ক্ষয়িষ্ণু; জনসংখ্যার চরিত্রও স্থানান্তর ও দেশান্তর গমনাগমনের ফলে পরিবর্তনশীল। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের সীমা পরিবর্তনে কোনো রাষ্ট্রেরই বিরোধিতা করার কোনো উপযুক্ত কারণ নেই। আর যদি কোনো আন্তর্জাতিক শক্তির হাতে এই পরিবর্তনের দায়িত্ব অর্পিত না হয়, তাহলে যুদ্ধের আয়োজনকে বাধা দেওয়া অনেক সময়ই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের একটি স্থলবাহিনী ও একটি নৌবাহিনী থাকা উচিত। এ দুটো ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো স্থলবাহিনী কিংবা নৌবাহিনীর অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়। বলপ্রয়োগের একমাত্র বৈধ কারণ হল, পৃথিবীতে মোট যত বলপ্রয়োগ ঘটে তার হ্রাস ঘটানো। যতদিন পর্যন্ত মানুষের বলপ্রয়োগ-প্রবৃত্তির অবাধ আত্মপ্রকাশের সুযোগ থাকবে, ততদিনই

১. আন্তর্জাতিক সরকারের বিস্তারিত পরিকল্পনার জন্য দ্রষ্টব্য : *International Goverment*, by L. Wolf, Allen & Unwin.

www.pathagar.com

মানুষের সমাজে এক দল অন্য দলের ওপর অত্যাচার করার ও লুটতরাজ চালাবার সুযোগকে কাজে লাগাবে। নাগরিকদের ব্যক্তিগত বলপ্রয়োগকে প্রতিরোধ করার জন্য যেমন পুলিশের ব্যবস্থা দরকার, তেমনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের বেআইনি বলপ্রয়োগকে প্রতিরোধ করার জন্যও একটি আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী দরকার।

কিন্তু আমার মনে হয়, এমন আশা যুক্তিসঙ্গত যে, যদি কখনো তেমন কোনো আন্তর্জাতিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়— একমাত্র যে সরকারেরই পদাতিক বাহিনী ও নৌবাহিনী থাকবে— তাহলে সেই সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য আদায়ের জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন অল্পকালই থাকবে। স্বল্পকালের মধ্যেই অরাজকতার জায়গায় আইনোদ্ভূত সুবিধাগুলো এত স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আন্তর্জাতিক সরকার তখন প্রশ্নাতীত কর্তৃপক্ষে পরিণত হবে, এবং তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার কথা আর কোনো রাষ্ট্রই স্বপ্নেও ভাববে না। সে পর্যায়ে পৌঁছবার পর আন্তর্জাতিক স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।

একটি আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের আরো অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমরা ক্রমে ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারব, সে ভবিষ্যৎদর্শন খুব কঠিন নয়। মনে হয়, মধ্যস্থের হাতে বিবাদ মীমাংসার ভার অর্পণের অভ্যাস ক্রমেই বেড়ে চলবে আর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ ঘটার সম্ভাব্য কারণগুলোকেও মানুষ ক্রমেই অলীক বলে ভাববে। এমনকি যেখানে সত্যসত্যই স্বার্থের সংঘাত রয়েছে, সেখানেও সময় থাকতেই স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিটি রাষ্ট্র স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে, যুদ্ধ করে তাদের যে ক্ষতি হবে তা সেই স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার ক্ষতির চেয়ে অনেক বড়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবিষ্কার-উদ্ভাবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের যুদ্ধ আরো অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে বাধ্য। পৃথিবীর সুসভ্য রাষ্ট্রসমূহের সামনে দুটোমাত্র বিকল্প রয়েছে : পারস্পরিক সহযোগিতা কিংবা পারস্পরিক ধ্বংস। বর্তমান যুদ্ধ এ দুটি বিকল্পকে ক্রমেই আরো স্পষ্ট করে তুলছে। যখন যুদ্ধোদ্ভূত এই শত্রুতা কমে আসবে, তখনো সভ্য মানুষ যুদ্ধবিলুপ্তির প্রশ্নে একমত না হয়ে সুনিশ্চিত ধ্বংসের পথকেই বেছে নেবে— এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

যে কয়টি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত বাধে বলে ধরে নেওয়া হয়, সেগুলো হল : শুল্ক— যা আসলে একটা প্রতারণা মাত্র; দুর্বল

www.pathagar.com

রাষ্ট্রগুলোকে শোষণ— যা একটা অপরাধ; এবং ক্ষমতা ও আধিপত্যের দর্প— যা আসলে বালকসুলভ নির্বুদ্ধিতা।

শুল্কের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুক্তি সকলেরই জানা, তার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। যে কারণে যুক্তি বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ হয় না তা হচ্ছে, বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক শত্রুতা। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের মধ্যে, কিংবা ল্যাঙ্কাশায়ার ও ইয়র্কশায়ারের মধ্যে শুল্ক প্রবর্তনের প্রস্তাব কেউই করেন না। তবে যেসব যুক্তির সাহায্যে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে শুল্ক সমর্থন করা হয়, সেগুলোর সাহায্যে দুই জেলা বা দুই অঞ্চলের মধ্যেও শুল্ক প্রবর্তনের কথা বলা যায়। আন্তর্জাতিক স্বাধীন বাণিজ্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর হবে। বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক ঘৃণা এবং সন্দেহ যদি বিলুপ্ত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে একদিন স্বাধীন বাণিজ্যনীতিই গৃহীত হবে। বিশ্বশান্তির দিক দিয়ে দেখলে, বিভিন্ন সভ্য রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীন বাণিজ্যের গুরুত্বের চেয়ে উপনিবেশ-দেশগুলোকে বাণিজ্যের সুযোগ দানের গুরুত্ব অনেক বেশি। সর্বত্র বাজার অন্বেষণের প্রবণতাই যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, দুর্বল জাতিগুলোকে শোষণ করা। বাণিজ্যই তাদের একমাত্র কিংবা প্রধান লক্ষ্য নয়, তারা চায় পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ, শিল্পের চেয়ে টাকা লগ্নিদানের উৎসাহই এক্ষেত্রে বেশি। সচেতনভাবেই হোক আর অসচেতনভাবেই হোক, প্রতিদ্বন্দ্বী কূটনীতিবিদরা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বী ধনিকগোষ্ঠীর দাস। অর্থলগ্নিদারদের নিজেদের যদিও কোনো জাতি নেই, তবু জাতিগত সংস্কারের সুড়সুড়ি দেওয়ার কৌশল তারা ভালোই জানে, এবং করদাতাদের যেসব ব্যয় থেকে তারা লাভবান হয় সেগুলোতে করদাতাদের আকৃষ্ট করতে তারা সক্ষম হয়। পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থাকে মেনে নেয়ার ফলে যে মাশুল পৃথিবীকে দিতে হয়, তারই একটা অংশ হল, স্বদেশে তাদের সৃষ্ট অনাচার আর যেসব জাতিকে তারা শোষণ করে সেগুলোর ওপর তাদের ধ্বংসলীলা।

কিন্তু জাতীয় গর্ববোধের ভাবাবেগ যুক্ত না হলে শুল্কের বা লগ্নিদারদের দ্বারা কোনো বিরাট ক্ষতি হত না। সভ্যতার পক্ষে যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, জাতীয় গর্ববোধ যদি সেগুলো নিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হত তাহলে তা মঙ্গলের কারণ হত। আমরা যদি আমাদের বৈজ্ঞানিক, কবি, কিংবা আমাদের সমাজব্যবস্থার ন্যায়বিচার ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষের জন্য গর্ব অনুভব করতাম, তাহলে জাতীয় গর্ববোধ থেকে আমরা মঙ্গলজনক প্রচেষ্টার প্রেরণা লাভ করতে

www.pathagar.com

পারতাম। কিন্তু জাতীয় গর্ববোধের ক্ষেত্রে এসব বিষয় সামান্যই গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত কেবল ক্ষমতা ও আধিপত্যের সঙ্গেই এই চেতনার সম্পর্ক দেখা যায়। জাতীয় গর্ববোধের লক্ষ্য স্বজাতির দখলকৃত ভূমির সীমা বর্ধন ও অন্য জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপর নিজের জাতির প্রভাব বিস্তার। সঙ্কীর্ণ দলীয় নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এসব প্রবণতা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রতি দশজন নাগরিকের নয়জনের মধ্যেই এটা প্রত্যক্ষ করা যায় যে, যখনই অন্য কোনো জাতির সঙ্গে তাদের জাতির কোনো ব্যাপারে সংঘর্ষের সূচনা হয়, তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মধ্যে ধারণা জাগে যে, তাদের জাতি নিশ্চিতভাবে ন্যায়পথেই আছে। এমনকি যদি কোনো বিশেষ বিরোধে কোনো জাতি ন্যায়পথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুতও হয়, তবু সেই জাতির লোকেরা ভাবে, তাদের বিপক্ষ-জাতির চেয়ে তাদের আদর্শ এত মহৎ যে, তাদের নিজেদের জাতির শক্তি বৃদ্ধি হলেই তা মানবজাতির পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। যেহেতু প্রত্যেক জাতিই নিজের সম্পর্কে এই রকম ধারণা পোষণ করে, সেজন্যই প্রত্যেক জাতি বিবাদের সময় জয়ের আশা দেখলেই নিজের জাতির জয়ের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। এই উত্তেজনা যতদিন থাকবে ততদিন আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও নিষ্প্রভ থাকতে বাধ্য।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতার যে প্রবল মনোভাব বর্তমান, তা যদি মানুষ ত্যাগ করতে পারত, তাহলে দেখা যেত, যেসব ব্যাপারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়, সেগুলোর চেয়ে যেসব ব্যাপারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বার্থের মিল ঘটে, সেগুলোর সংখ্যা অনেক বেশি। তখন প্রত্যেক জাতিই বুঝতে পারত, বাণিজ্য সংঘর্ষের কারণ হতে পারে না, আর যে ব্যক্তি কারো কাছে পণ্য বিক্রি করে, সে ক্রেতার কোনো ক্ষতি করে না। কশাই আর রুটিওয়ালাকে কেউই শত্রু ভাবে না যদিও তারা সবসময়ই মানুষের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যায়। কিন্তু যখনই বিদেশ থেকে কোনো পণ্য আমাদের দেশে আসে, তখনই আমাদের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে দেয়া হয় যে, সেগুলো কেনাতে আমাদের ভয়ানক ক্ষতি। কেউই এটা ভেবে দেখে না যে, নিজেদের দেশের পণ্য বিদেশে রপ্তানি করেই বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করা হয়, নিজের দেশ থেকে বিদেশে যে পণ্য আমরা রপ্তানি করি সেগুলোকে সেখানে বিপজ্জনক বলে ভাবা হয় এবং সে দেশ থেকে যে পণ্য আমরা আমদানি করি সেগুলোর কথা সেখানকার সবাই ভুলে যায়। যেসব উৎপাদনকারী বিদেশি উৎপাদনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে ভয় পায়, যেসব ট্রাস্ট একচেটিয়া বাণিজ্যের স্বপ্ন

www.pathagar.com

দেখে, এবং যেসব অর্থনীতিবিদের মন উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন, তারা আমাদের মনে বাণিজ্য সম্পর্কে যে ধারণা জাগিয়ে দিয়েছে তা পুরোপুরি মিথ্যা। শ্রমবিভাগ থেকেই বাণিজ্যের উৎপত্তি। কোনো মানুষই নিজের প্রয়োজনের সকল সামগ্রী উৎপাদন করতে পারে না, সে জন্যই অন্যের সঙ্গে তার পণ্যবিনিময় অপরিহার্য। ব্যক্তির বেলায় যা প্রযোজ্য তা একইভাবে জাতির বেলায়ও প্রযোজ্য। এমন আশা করার কোনো কারণ নেই যে, একটি জাতির প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রীই সে জাতি নিজে তৈরি করে নেবে। বরং এটাই উত্তম ব্যবস্থা যে, যেসব জিনিস উৎপাদন করা তার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক, সেগুলোই সে বিশেষভাবে উৎপাদন করবে, এবং উৎপন্ন দ্রব্যের যেটুকু নিজের জাতির প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেটুকু অন্য জাতির উৎপাদিত প্রয়োগাতিরিক্ত সামগ্রীর সঙ্গে বিনিময় করবে। অন্য দেশ থেকে জিনিস আনার দরকার না থাকলে নিজের দেশ থেকে জিনিস বিদেশে পাঠানোরও দরকার থাকত না। যে কশাই সবসময়েই তার মাংসের কাটতির জন্য আগ্রহী, অথচ রুটিওয়ালার কাছ থেকে রুটি নিতে, জুতানির্মাতার কাছ থেকে জুতা নিতে, কিংবা দর্জির কাছ থেকে কাপড় নিতে অনিচ্ছুক, সে নিজেকে শীঘ্রই বিপদগ্রস্ত দেখতে পাবে। তবে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি না করেই যে ব্যক্তি নিজের দেশের পণ্য বিদেশে পাঠাতে চায়, তার চেয়ে ওই কশাই কম আহাম্মক।

মজুরি প্রথা মানুষের মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের শুধু কাজ দরকার। এই ধারণা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক। আসলে যা দরকার তা হল, কাজের দ্বারা অর্জিত ফল। নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল লাভের জন্য যত কম কাজের প্রয়োজন হয়, ততই ভালো। কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন যে, এতে উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিয়োগকারী নিযুক্তদের অনেককে বরখাস্ত করে দিয়ে অনাহারের সম্মুখীন করতে পারে। যদি আরো উন্নত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হত তাহলে হয় শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি পেত, নাহয় বেতন হ্রাস না করেই তার কাজের সময় কমানো যেত।

আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উল্টো নিয়মে চলছে। এতে ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে সমাজের স্বার্থের হাজার রকমের সংঘাত। কিন্তু উন্নততর পদ্ধতিতে এ ধরনের সংঘাতের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, মুক্ত বাণিজ্যের সুবিধা ও শুল্কের অসুবিধা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বাণিজ্যের কথা বাদ দিলে, যেসব বিষয় নিয়ে সভ্যতা গড়ে ওঠে সেগুলোতে বিভিন্ন জাতির স্বার্থ একসূত্রে বাঁধা। আবিষ্কার-উদ্ভাবনের দ্বারা সকলেরই মঙ্গল

www.pathagar.com

সাধিত হয়। বিজ্ঞানের উন্নতি সমস্ত সভ্য জগতের কাছেই একই রকম লাভজনক। একজন বৈজ্ঞানিক জাতিতে ইংরেজ, না ফরাসি, না জার্মান, তা আসলে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর আবিষ্কারসমূহে সকলেরই সমান অধিকার, সেগুলো দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য প্রয়োজন একমাত্র বুদ্ধির। শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞানের জগৎটা পুরোপুরি আন্তর্জাতিক। এসব ক্ষেত্রে এক দেশে যা সৃষ্টি হয়, তা কেবল সেই দেশের জন্যই নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য। যদি আমরা নিজেরা নিজেদের প্রশ্ন করি— কী কী কারণে মানুষ পশুর ঊর্ধ্বে, কী কী জিনিসের জন্য আমরা ভাবতে পারি যে, মানবপ্রজাতি অন্য যে কোনো প্রজাতির চেয়ে উৎকৃষ্ট, তাহলে আমরা দেখতে পাব, সেগুলোর একটিও কোনো এক জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, বরং প্রত্যেকটিই এমন জিনিস যাতে সমগ্র মানবজাতির অধিকার রয়েছে। সেসব জিনিসের প্রতি যাঁদের একটুও অনুরাগ রয়েছে, যাঁরা মনুষ্যত্বের ও মনুষ্যোচিত কার্যাবলিতে মানবজাতিকে সাফল্যমণ্ডিত দেখতে চান তাঁরা জাতীয় সীমার প্রতি কম মনোযোগ দেন, কোন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত তা-ও কম হিসাব করেন।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বাইরে অন্যক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি। কিছুকাল আগে পর্যন্ত আমি একটি নতুন বিজ্ঞানের শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলাম। পৃথিবীর অত্যন্ত অল্প সংখ্যক লোকই সে বিজ্ঞান শিক্ষাদানে সমর্থ। এই বিজ্ঞানে আমার নিজের কাজ মূলত একজন জার্মান ও একজন ইতালিয়ানের কাজের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আমার ছাত্রেরা এসেছিল সব দেশ থেকেই : ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, গ্রিস, জাপান, চীন, ভারত ও আমেরিকা থেকে। আমরা আমাদের জাতীয়তার বিভিন্নতা সম্পর্কে একটুও সচেতন ছিলাম না। আমরা নিজেদেরকে সভ্যতার সেবক বলে ভেবেছি, মনে হয়েছে যেন এক অজ্ঞাত অরণ্যের মধ্য দিয়ে— যেখানে কোনো কালে কোনো মানুষের পদক্ষেপ পড়েনি— আমরা নতুন পথ তৈরি করে করে অগ্রসর হচ্ছি। এক মহান কাজে আমরা সকলেই পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি। কাজের স্বার্থে বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক শত্রুতাকে আমাদের কাছে নিতান্ত তুচ্ছ, সাময়িক এবং নিরর্থক মনে হয়েছে।

কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যে কেবল রহস্যময় বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ লঘু আবহাওয়াতেই প্রয়োজন, তা নয়; আমাদের সকল অর্থনৈতিক সমস্যা, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল প্রশ্ন, স্বদেশে ও বিদেশে

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল আশা নির্ভর করে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার ওপর।

যতদিন মানুষ পারস্পরিক ঘৃণা, সন্দেহ ও ভয়ের দ্বারা পরিচালিত হবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা বলপ্রয়োগের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিক শক্তির হাত থেকে মুক্তিলাভ আশা করতে পারব না। সেসব ব্যাপারে মানুষকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। আর যেসব কাল্পনিক স্বার্থের প্রশ্নে বিভিন্ন জাতির স্বার্থ বিভক্ত, সেগুলো ভুলতে হবে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের যে বৈচিত্র্য, তা বিলুপ্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই, আর বৈচিত্র্যের বিলোপ কাম্যও নয়। এই বৈচিত্র্যের ফলে প্রত্যেক জাতি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অবদানের দ্বারা বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে পারে।

আসলে যা কাম্য তা বিশ্বনাগরিকতাবাদ নয়; গতানুগতিকভাবে ক্রমাগত বিভিন্ন সভ্যদেশের মানুষের সান্নিধ্যে আসার ফলে দূতাবাসের কর্মচারীদের কিংবা বিমানবালাদের জীবনের স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রায় সব বৈশিষ্ট্য যেভাবে মুছে যায়, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের তেমন অবলুপ্তি কাম্য নয়। এ ধরনের বিশ্বনাগরিকতা ক্ষতির ফল, লাভের নয়। যে আন্তর্জাতিক মনোবল আমরা দেখতে চাই তা স্বদেশপ্রেমের সঙ্গেই যুক্ত, স্বদেশপ্রেমকে খর্ব করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। স্বদেশপ্রেম যেমন কাউকে নিজের গ্রামের জন্য প্রীতি অনুভব করতে বাধা দেয় না— এটাও তেমনই। কিন্তু এতে সে চেতনার কিছুটা রূপান্তর সাধিত হবে। কেউ তার নিজের দেশের জন্য যা কামনা করবে তা কোনো সময়ই কেবল অন্য দেশকে বঞ্চিত করে লাভ করার জিনিস হবে না। বরং তা হবে এমন জিনিস যার উৎপাদনে যে কোনো দেশ উৎকর্ষ লাভ করলে সমগ্র পৃথিবী তার দ্বারা লাভবান হবে। প্রত্যেকেই চাইবে, তার নিজের দেশ শান্তির উপায় উদ্ভাবনে মহত্ত্ব প্রমাণ করুক— চিন্তা ও বিজ্ঞানের জগতে খ্যাতিমান হোক— ন্যায়বান, উদার ও মহান হোক। প্রত্যেকেই চাইবে, তার দেশ স্বাধীন ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতিভিত্তিক উন্নততর পৃথিবী সৃষ্টিতে মানবজাতিকে সাহায্য করুক। মানুষকে যদি কিছু পরিমাণেও সুখী হতে হয়, তাহলে স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতিতে পূর্ণ এক উন্নততর পৃথিবী অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। কেউ চাইবে না যে, তার দেশ কেবল সঙ্কীর্ণ স্বত্বলিপ্সার নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী বিজয়েই জয়ী হোক; বরং প্রত্যেকেই চাইবে, তার দেশ মানবিক কার্যাবলিতে সাহায্য করে সহনশীলতার সঙ্গে অগ্রসর হোক; যিশু যাকে ভ্রাতৃত্ববোধ বলে শিক্ষা

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন অথচ খ্রিস্টান গির্জাগুলো যা ভুলে বসে আছে, সেই আদর্শ অনুসরণ করুক— স্থায়ী বিজয় অর্জন করুক। প্রত্যেকেই দেখতে পাবে, এই প্রেরণার মধ্যে কেবল মহত্তম নৈতিক চেতনাই নিহিত নেই, বরং এতে রয়েছে সবচেয়ে সত্য প্রজ্ঞাও। প্রত্যেকে উপলব্ধি করবে, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের উন্মত্ততা দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত জাতিসমূহ কেবল এই পথ অবলম্বন করেই বিকাশোন্মুখ এমন এক নতুন জীবনে প্রবেশ করতে পারবে যে জীবন থেকে মিথ্যা ও অবাস্তব কর্তব্যের উন্মত্ত আহ্বানে আনন্দ বিদায় নেবে না। ঘৃণা যেসব কাজের পেছনে উৎসাহ জোগায় সেগুলোতে যত দুঃখ ভোগ ও আত্মত্যাগই থাকুক, সেগুলো কর্তব্য নয়। প্রেম ও ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যেসব কাজ করা হয়, সেগুলোর মধ্যেই সত্যিকার জীবন এবং পৃথিবীর মঙ্গল ও আশা-ভরসা নিহিত।

www.pathagar.com

সংযোজন

নোবেল পুরস্কার গ্রহণকালের বক্তৃতা
রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি-প্রবৃত্তি

রাজনীতি ও রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কিত আজকালকার আলোচনায় মনোজগতের বিষয়াদি খুব কমই বিবেচনা করা হয় বলে আমার ধারণা। এ জন্যই আজ রাতের বক্তৃতার[১] বিষয় হিসেবে এ বিষয়টি আমি বেছে নিয়েছি। অর্থনৈতিক ঘটনাবলি, জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলি, সাংবিধানিক কাঠামো এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়। কোরিয়ার যুদ্ধের শুরুতে উত্তর কোরিয়ায় ও দক্ষিণ কোরিয়ায় লোকসংখ্যা কত ছিল তা খুঁজে বের করতে কোনো অসুবিধা হয় না। আপনারা যদি ঠিক ঠিক বইগুলোতে খোঁজ করেন, তাহলে সহজেই জানতে পারবেন, তাদের মাথাপিছু গড় আয় কত ছিল এবং তাদের কোন পক্ষের সেনাবাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা কত ছিল। কিন্তু আপনাদের যদি জানার দরকার হয় : একজন কোরিয়ান কী প্রকৃতির লোক এবং একজন উত্তর কোরিয়ান ও একজন দক্ষিণ কোরিয়ানের মধ্যে সত্য সত্যই কোনো পার্থক্য আছে কি-না, যদি আপনারা জানতে আগ্রহী হন : তাদের মধ্যে কোন পক্ষের জীবনদৃষ্টি কী, তাদের অসন্তোষ কী কী, আশা কী কী, ভয় কী কী— এক কথা তাদের ভাষায় যা 'তাদের হৃদয়কে স্পন্দিত করে' তা কী— তাহলে তথ্যাদির জন্য ব্যবহৃত গ্রন্থগুলোতে আপনাদের আদ্যন্ত অনুসন্ধান অনর্থক হবে। আর সেজন্যই আপনারা বলতে পারেন না, দক্ষিণ কোরিয়ানরা জাতিসঙ্ঘে স্থান পেতে উদগ্রীব, না কি তারা তাদের উত্তর কোরিয়ান ভাইদের সঙ্গে একত্রিত হওয়াকেই বেশি পছন্দ করবে। আর আপনারা অনুমানও করতে

১. ১৯৫০ সনে বার্ট্রান্ড রাসেলকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ওই বছরের ১১ সেপ্টেম্বর স্টকহ্লমে পুরস্কার গ্রহণ করতে গিয়ে সুইডিশ একাডেমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাসেল যে বক্তৃতা দেন, বর্তমান প্রবন্ধ তারই অনুবাদ। — অনুবাদক

www.pathagar.com

পারেন না, তাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো রাজনীতিবিদের ভোট পাওয়ার সুবিধার জন্য তারা ভূমিসংস্কারের প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে সম্মত কি না। এসব প্রশ্নের প্রতি দূরবর্তী রাজধানীতে অবস্থানকারী বিখ্যাত ব্যক্তিদের অবহেলাই প্রায়শ হতাশার কারণ হয়। রাজনীতিকে যদি বিজ্ঞানসম্মত করতে হয়, আর পরিণামকে যদি সব সময় বিস্ময়কর দেখাতে না হয়, তাহলে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাকে মানবিক কার্যকলাপের মূল উৎসের আরো গভীরে প্রবেশ করানো একান্ত দরকার। স্লোগানের ওপর ক্ষুধার প্রভাব কী? আপনাদের খাদ্যে ক্যালোরির হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে স্লোগানের কার্যকারিতার ওঠা-নামার সম্পর্ক কতখানি? এক ব্যক্তি যদি আপনাকে গণতন্ত্র প্রদানের প্রস্তাব করেন এবং অপর এক ব্যক্তি যদি আপনাকে একবস্তা খাদ্যবস্তু দানের প্রস্তাব করেন, তাহলে অনাহারের কোন পর্যায়ে আপনি ভোটের চেয়ে খাদ্যদ্রব্যকে উৎকৃষ্টতর মনে করবেন?— এসব প্রশ্নের বিবেচনা খুব কমই করা হয়। যা হোক, কোরিয়ানদের কথা আপাতত ভুলে গিয়ে চলুন এখন আমরা সমগ্র মানবজাতির কথা চিন্তা করি।

মানুষের সকল কাজেরই মূলে থাকে প্রবৃত্তির তাড়না। কিছুসংখ্যক নৈতিকতাবাদী প্রাণান্তকর চেষ্টা দ্বারা এই মর্মে একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন যে, কর্তব্য-অকর্তব্য ও ন্যায়-অন্যায় বিচারসংক্রান্ত নীতির দাবিতে প্রবৃত্তিকে দমন করা সম্ভব। এ তত্ত্ব সম্পূর্ণই প্রতারক। এ তত্ত্বকে যে আমি প্রতারক বলি তার কারণ এই নয় যে, কোনো লোকই কোনোকালে কর্তব্যবোধ থেকে কোনো কাজ করে না। আমার একথা বলার কারণ, যদি কোনো ব্যক্তির অন্তরে কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার ইচ্ছা না জাগে তাহলে তার ওপর কর্তব্যের কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। মানুষের আচরণ সম্পর্কে যদি আপনারা জানতে চান তাহলে আপনাদের একমাত্র কিংবা প্রধানত, মানুষের বাস্তব পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানলেই চলবে না, মানুষের অন্তর্গত সত্তার— তথা বৃত্তি-প্রবৃত্তির গোটা প্রণালিকে এবং সেই প্রণালির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার আপেক্ষিক শক্তিকেও অবশ্যই জানতে হবে।

কতকগুলো প্রবৃত্তি অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও সাধারণত সেগুলোর বড় রকমের কোনো 'রাজনৈতিক' গুরুত্ব নেই। প্রায় সব মানুষেরই জীবনে কোনো না কোনো সময়ে বিয়ে করার আগ্রহ জাগে, এবং সাধারণত কোনো রাজনৈতিক কাজের দায়িত্ব ছাড়াই মানুষ এই আগ্রহকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে এ ক্ষেত্রে; স্যাবাইন জাতির মেয়েদের হরণ

www.pathagar.com

করে নেওয়ার ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। আর উত্তর অস্ট্রেলিয়ার উন্নয়ন যে গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে, তারও কারণ, যে বীর্যবান যুবকদের সেখানে কাজ করা উচিত তারা নারীসংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকতে চায় না। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ব্যতিক্রমই, সাধারণত নারী ও পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের প্রভাব রাজনীতির ওপর খুবই সামান্য।

রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃত্তিগুলোকে মুখ্য ও গৌণ, এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মুখ্য ভাগে পড়ে জীবনধারণের অপরিহার্য বিষয়গুলো : খাদ্য, আশ্রয় ও পরিধেয়। এসব জিনিস যদি একান্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে, তাহলে এগুলো পাওয়ার আশায় মানুষ যেভাবে চেষ্টা চালাবে কিংবা হিংসার পথে অগ্রসর হবে, তার কোনো পরিমাপ নেই। প্রাচীন ইতিহাসের পাঠকেরা বলে থাকেন, আরবের লোকেরা বিভিন্ন পর্যায়ে অনাবৃষ্টির দরুন চার বার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া হয় সুদূরপ্রসারী। এই চারটি ঘটনার মধ্যে শেষেরটি হল ইসলামের অভ্যুদয়। জার্মান গোত্রসমূহের ধীরে ধীরে রাশিয়া থেকে ইংল্যান্ডে ও পরে সান ফ্রান্সিসকোতে ছড়িয়ে পড়ার পেছনেও একই ধরনের ঘটনা চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। খাদ্যের তাড়না নিঃসন্দেহে চিরকাল বিরাট বিরাট রাজনৈতিক ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে এসেছে এবং আজও হচ্ছে।

কিন্তু যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা তা হল : মানুষের এমন কতগুলো প্রবৃত্তি রয়েছে যেগুলো বলতে গেলে অন্তহীন, যেগুলোর পূর্ণ পরিতৃপ্তি কখনো সম্ভব নয়, এবং যেগুলো বেহেশ্‌তেও মানুষকে অস্থির করে রাখবে। অতিকায় অজগর উদরপূর্তির পর ঘুমিয়ে থাকে এবং পুনরায় ক্ষুধা না লাগলে জাগে না। মানুষের প্রকৃতি কিন্তু মোটেই এ রকম নয়। যে আরবরা একসময় অল্প কয়েকটি খেজুর খেয়ে নিতান্ত দরিদ্র জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল তারা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্পদের অধিকারী হয়ে প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের বিলাসিতামণ্ডিত প্রাসাদে বাস করেও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েনি। দারিদ্র্যের স্থলে যখন প্রাচুর্য এল তখন আর ক্ষুধা তাদের জীবনে চালিকাশক্তি হিসেবে কার্যকর রইল না; কারণ গ্রিক দাসেরা সামান্য ইশারাতেই তাদেরকে চমৎকার সব খাদ্যসামগ্রী এনে দিত। কিন্তু অন্যান্য প্রবৃত্তি তখনো তাদেরকে সক্রিয় রেখেছিল। সেগুলোর মধ্যে চারটির কথা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় : সম্পত্তিলিপ্সা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যশোলিপ্সা এবং ক্ষমতানুরাগ।

www.pathagar.com

সম্পত্তিলিপ্সা হল, যত বেশি সম্ভব বস্তুসম্পদ নিজের দখলে রাখার কিংবা মালিকানা ভোগের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার উৎস, আমার মনে হয়, একদিকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি না পাওয়ার ভয় এবং অপরদিকে সেগুলো অর্জনের তাগিদ— উভয়ের মধ্যেই নিহিত। আমি একবার ইস্তোনিয়ার দুটি ছোট্ট মেয়েকে সাহায্য করেছিলাম। মেয়ে দুটি মন্বন্তরের সময় অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। তারা আমার পরিবারে বাস করত এবং অবশ্যই প্রচুর খেতে পেত। কিন্তু তারা সমস্ত অবসর সময় কাটাত পার্শ্ববর্তী শস্যক্ষেত্রে ঘোরাফেরা করে, আলু চুরি করে। আলুগুলো তারা সঞ্চয় করত। রকফেলার শৈশবে চরম দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তী জীবনটাও তিনি কাটিয়েছেন একইভাবে। তেমনি আরব সর্দাররা রেশমি বাইজেন্টাইন ডিভানের উপর বসেও মরুভূমির কথা ভুলতে পারেননি, এবং তাঁরা জীবনযাপনের জন্য যত সম্পদ দরকার হতে পারে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি সম্পদ মজুদ করেছিলেন। সম্পত্তিলিপ্সার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যা-ই হোক, একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, এটা একটা প্রধান তাড়না— বিশেষ করে অধিক ক্ষমতাবান লোকদের জীবনে। আর একথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, মানুষের অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাগুলোর মধ্যে এটা একটা। যত বেশিই আপনি লাভ করুন না কেন, সবসময়ই আরো বেশি আপনি পেতে চাইবেন। সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হল এক স্বপ্ন, আর এই স্বপ্ন সবসময় আপনাকে ছলনা করবে।

সম্পত্তিলিপ্সা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রধান চালিকাশক্তি। কিন্তু ক্ষুধাকে জয় করার পর মানুষের যেসব বৃত্তি সজাগ থাকে, সেগুলোর মধ্যে এটি কোনোক্রমেই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বৃত্তি নয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবৃত্তি অনেক বেশি শক্তিশালী। মুসলমানদের ইতিহাসে রাজবংশগুলো যে কারণে বার বার দুর্দশায় পতিত হয়েছে তা হল : কোনো সুলতানের বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা একতাবদ্ধ থাকতে পারেনি, ফলে দেখা দিয়েছে গৃহযুদ্ধ আর গৃহযুদ্ধের ফলে এসেছে সার্বিক ধ্বংস। একই ধরনের ঘটনা আধুনিক ইউরোপেও ঘটেছে। ব্রিটিশ সরকার যখন নিতান্ত অবিবেচকের মতো জার্মান সম্রাটকে নৌবাহিনী পরিদর্শনে স্পিটহেডে উপস্থিত হতে অনুমতি দিল, তখন সম্রাটের মনে যে চিন্তা জাগল, তা আমাদের অভিপ্রেত ধারণা থেকে সম্পূর্ণই ভিন্ন। তিনি চিন্তা করলেন, "আমারও অবশ্যই রানির নৌবাহিনীর মতো একটা নৌবাহিনী গড়ে তুলতে হবে।" এই আমাদের পরবর্তী দুর্দশার উৎস। সম্পত্তিলিপ্সা যদি সবসময়

www.pathagar.com

প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাড়না থেকে শক্তিশালী হত, তাহলে পৃথিবী বর্তমানের চেয়ে অনেক সুখের স্থান হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক লোকই সানন্দে দারিদ্র্য বরণ করে নেবে যদি তার বিনিময়ে তারা প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটাতে পারে। এ মনোবৃত্তির কারণেই করভার বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে।

খ্যাতিলিপ্সা, তথা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার আকাঙ্ক্ষা হল একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা। শিশুদের নিয়ে যাঁদের ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁরা জানেন, কেমন করে শিশুরা সবসময় অদ্ভুত কিছু করতে থাকে এবং বলতে থাকে, 'আমার দিকে তাকাও।' 'আমার দিকে তাকাও'-এর প্রবৃত্তি মানবহৃদয়ের একটি অত্যন্ত মৌলিক প্রবৃত্তি। ভাঁড়ামি থেকে আরম্ভ করে মরণোত্তর খ্যাতি অর্জনের প্রয়াস পর্যন্ত অসংখ্য রূপে এই প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি ঘটতে পারে। রেনেসাঁর-কালের ইতালির এক ক্ষুদ্র নৃপতিকে মৃত্যুশয্যায় যাজক জিগ্যেস করেছিলেন, অনুশোচনা করার মতো তাঁর কিছু আছে কি না। নৃপতি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, একটি বিষয় আছে। একবার এক অনুষ্ঠানে আমি একসঙ্গে সম্রাট এবং পোপ উভয়েরই সাক্ষাৎ লাভ করেছিলাম। তখন আমি তাঁদেরকে নিয়ে আমার সুউচ্চ দুর্গের শীর্ষে গিয়েছিলাম দৃশ্য দেখার উদ্দেশ্যে, এবং তাঁদের উভয়কে নিচে ফেলে দেওয়ার সুযোগ তখন আমি হেলায় হারিয়েছিলাম। তখন যদি আমি তাঁদেরকে নিচে ফেলে দিতাম, তাহলে আমি অমর খ্যাতির অধিকারী হতাম।" ইতিহাসে বর্ণিত নেই, যাজক তাঁর পাপমুক্তির অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন কি না। নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রবৃত্তি নিয়ে একটা অসুবিধা এই যে, যে কোনো দিক থেকে প্রশংসার ইন্ধন পেলেই তা আরো বেশি করে জ্বলে ওঠে। আপনার সম্পর্কে যতই আলোচনা হয়, ততই আপনি আরো বেশি করে আলোচিত হতে চাইবেন। ঘৃণ্য হত্যাকারীকে যদি তার বিচারের বিবরণ খবরের কাগজে দেখতে দেওয়া হয়, তাহলে কোনো কাগজে তার বিবরণ কম উঠেছে দেখলে সে রাগান্বিত হয়, আর অন্যান্য কাগজে নিজের সম্পর্কে যতই সে বেশি উল্লেখ দেখতে পায় ততই ওই কম-বিবরণ-দানকারী কাগজের প্রতি তার রাগ বাড়তে থাকে। রাজনীতিবিদদের আর কবি-সাহিত্যিক-লেখকদের বেলায়ও এই রকমই ঘটে থাকে। যতই তাঁরা বিখ্যাত হতে থাকেন, প্রেস-কাটিং সংস্থাগুলো তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে ততই বেশি করে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তিন বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে যার ভ্রুকুটিতে দুনিয়া প্রকম্পিত হয় সেই ক্ষমতাবান পর্যন্ত— সকলের জীবনেই নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের বাসনা তথা খ্যাতিলিপ্সা এত প্রবল যে, তার কোনো প্রকার

www.pathagar.com

অতিরঞ্জন সম্ভব নয়। মানবজাতি এমনকি এমন ধর্মবিগর্হিত কাজও করেছে যে, বিধাতাকে পর্যন্ত এই প্রবৃত্তির শিকার বানিয়েছে : বিধাতাকে মানুষে কল্পনা করেছে সর্ব মুহূর্তে প্রশংসালোলুপ রূপে।

আমাদের আলোচিত মানবজীবনের এসব চালিকাশক্তি প্রবল। কিন্তু এসবের তাড়না যতই প্রবল হোক, এগুলোর বাইরে আর একটি প্রবৃত্তি রয়েছে যেটি এই সবগুলোর চেয়েই শক্তিশালী। তা হল ক্ষমতালিপ্সা। নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের বাসনার তথা খ্যাতিলিপ্সার সঙ্গে ক্ষমতালিপ্সার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। কিন্তু কোনোক্রমেই এ দুটি সম্পূর্ণ এক জিনিস নয়। নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের বাসনা পূরণের জন্য প্রয়োজন হয় যশ বা খ্যাতির, আর ক্ষমতা ছাড়াই খ্যাতি অর্জন সহজ। যুক্তরাষ্ট্রে যাঁরা সবচেয়ে বেশি খ্যাতির অধিকারী তাঁরা হলেন চিত্রতারকা। কিন্তু 'কমিটি ফর আনআমেরিকান একটিভিটিজ'-এর মতো মর্যাদাহীন প্রতিষ্ঠানও চিত্রতারকাদের খ্যাতির অবসান ঘটাতে পারে। ইংল্যান্ডে রাজার গৌরব প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে বেশি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা রাজার চেয়ে বেশি। অনেক লোক ক্ষমতার চেয়ে যশ বা খ্যাতিকে বেশি মূল্যবান মনে করেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তুলনায় যাঁরা খ্যাতির চেয়ে ক্ষমতাকে বেশি মূল্য দেন, ঘটনাপ্রবাহের ওপর তাঁদের ভূমিকাই বেশি কার্যকর হয়। ১৮১৪ সনে ব্লুচার নেপোলিয়নের প্রাসাদগুলো দেখে বলেছিলেন, "এত কিছুর অধিকারী হয়েও যিনি মস্কোতে অভিযান চালিয়েছিলেন, তিনি কী বোকাই না ছিলেন!" নেপোলিয়ন অবশ্যই খ্যাতি অর্জনে নিতান্ত ব্যর্থ ছিলেন না; তবু পছন্দ করার সময় তিনি ক্ষমতাই পছন্দ করেছিলেন। ব্লুচারের কাছে এই পছন্দটিকে বোকামি মনে হয়েছে। খ্যাতিলিপ্সার মতো ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষারও পূর্ণ পরিতৃপ্তি কখনো সম্ভব নয়। একমাত্র সর্বশক্তিমান হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই এই প্রবৃত্তির পূর্ণ পরিতুষ্টি ঘটতে পারে না। আর যেহেতু প্রবলভাবে সক্রিয় লোকদের মধ্যেই বিশেষ করে এই দোষ দেখা যায়, সেজন্যই কখনো কখনো তাঁদের জীবনে ক্ষমতালিপ্সার পক্ষে তৃপ্তিকর কিছু কিছু ফল লাভ হলেও এই লিপ্সা যেভাবে বেড়ে যেতে থাকে তার সঙ্গে তুলনায় লব্ধ ফল এতই সামান্য হয় যে, দুয়ের মধ্যে কোনো প্রকার তুলনাই চলে না। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জীবনে অন্যান্য আকাঙ্ক্ষার তুলনায় নিঃসন্দেহে এই আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি প্রবল।

ক্ষমতা উপভোগের অভিজ্ঞতা ক্ষমতানুরাগকে খুবই বাড়িয়ে দেয়। এ কথা ক্ষুদ্র ক্ষমতার বেলায় যেমন প্রযোজ্য, তেমনি বিরাট রাজকীয় ক্ষমতার বেলায়ও প্রযোজ্য। ১৯১৪ সনের পূর্ববর্তী সুখের দিনগুলোতে সচ্ছল মহিলারা বাড়িতে

www.pathagar.com

বিরাট একদল চাকর রাখতে সক্ষম হতেন। সে অবস্থায় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক ব্যাপারাদিতে ক্ষমতা খাটানোর আনন্দ তাঁদের ক্রমাগত বেড়ে চলত। একইভাবে যে কোনো স্বৈরাচারী সরকারের ক্ষমতাসীন লোকেরা ক্ষমতা উপভোগের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান হারে অত্যাচারী হতে থাকে। মানুষের ওপর ক্ষমতা দেখানোর উপায় হল, কেউ যা করতে চায় না, তা করতে তাকে বাধ্য করা। এজন্যই যে ব্যক্তি শুধুই ক্ষমতার বাসনা দ্বারা চালিত, তিনি দুঃখ দেওয়াতে যতটা নিপুণ, আনন্দ অনুমোদনে কখনো ততটা উদার নন। কোনো বৈধ কারণে অফিসে অনুপস্থিত থেকে যদি আপনি আপনার উপরওয়ালার কাছে ছুটি চান, তাহলে তাঁর ক্ষমতার বাসনা সম্মতি দেওয়ার চেয়ে অসম্মতি জ্ঞাপনে বেশি পরিতৃপ্ত হবে। আপনি যদি দালান তোলার অনুমতি চান, তাহলে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদে আমলা স্পষ্টতই 'হ্যাঁ' বলার চেয়ে 'না' বলে বেশি আনন্দ পাবেন। এ ধরনের বিষয়গুলোই ক্ষমতার বাসনাকে এত বিপজ্জনক প্রবণতায় পরিণত করে।

কিন্তু ক্ষমতানুরাগের অন্য দিকও রয়েছে যা খুবই অভিপ্রেত। আমি মনে করি, জ্ঞানানুশীলনের পেছনে ক্ষমতার বাসনাই প্রধান চালিকাশক্তি। একথা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সকল অগ্রগতি সম্পর্কেই খাটে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও একজন সংস্কারকের ঠিক একজন স্বৈরাচারীর মতোই ক্ষমতানুরাগ থাকতে পারে। ক্ষমতার বাসনা মাত্রকেই একটি সম্পূর্ণ দূষণীয় প্রবণতা বলে সিদ্ধান্ত করলে তা সম্পূর্ণ ভুল হবে। এই বাসনা দ্বারা আপনি ভালো কাজে, না খারাপ কাজে পরিচালিত হবেন তা নির্ভর করে সমাজব্যবস্থার ওপর এবং আপনার অন্তঃস্থিত সামর্থ্যের প্রকৃতির ওপর। আপনার সামর্থ্য যদি তাত্ত্বিক কিংবা প্রকৌশলগত হয়, তাহলে আপনি জ্ঞান কিংবা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অবদান রাখবেন এবং সাধারণভাবে আপনার কাজ মঙ্গলকর হবে। আপনি যদি রাজনীতিবিদ হন তাহলে ক্ষমতার বাসনা আপনার চালিকাশক্তি হবে, তাতে সাধারণত আপনার বাসনার সঙ্গে এমন কিছু কাজ করার আকাঙ্ক্ষাও যুক্ত থাকবে যে কাজকে কোনো না কোনো কারণে আপনি 'প্রচলিত অবস্থা'র চেয়ে উন্নত অবস্থা সৃষ্টির উপায় বলে মনে করেন। এলসিবিএডস্-এর মতো বিরাট জেনারেল কোন পক্ষে যুদ্ধ করেন সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হতে পারেন; কিন্তু প্রায় সকল জেনারেলই নিজের দেশের পক্ষে যুদ্ধ করাকে উৎকৃষ্টতর মনে করেন, এবং সেজন্যই ক্ষমতার বাসনা ছাড়া অন্য বাসনাও তাঁদের থাকে। কোনো রাজনীতিবিদ সবসময় নিজেকে সংখ্যাধিকের মধ্যে দেখার জন্য ঘন ঘন দলবদল করতে

www.pathagar.com

পারেন; কিন্তু প্রায় সব রাজনীতিবিদই এক দলের চেয়ে অন্য দলকে উৎকৃষ্টতর মনে করেন, এবং তাঁদের ক্ষমতার বাসনাকে এই পছন্দের অধীন রাখেন। ক্ষমতার বাসনাকে যতদূর সম্ভব অবিমিশ্র অবস্থায় নানা ধরনের লোকের মধ্যে দেখা যেতে পারে। এক ধরনের লোক বেশি বেতন বা পদোন্নতির জন্য যে কোনো জায়গায় কাজ করতে উদ্গ্রীব : এর সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ নেপোলিয়ন। আমি মনে করি, কর্সিকার চেয়ে ফ্রান্সের প্রতি নেপোলিয়নের কোনো আদর্শগত অনুরাগ ছিল না, কিন্তু তিনি যদি কর্সিকার সম্রাট হতেন তাহলে একজন ফরাসি হিসেবে ভান করে তিনি যত বড় হয়েছিলেন তত বড় হতে পারতেন না। এই ধরনের লোকেরাও অবশ্য এর সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ উদাহরণ নন, কারণ এঁরাও নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ দ্বারা প্রচুর তৃপ্তি লাভ করেন। সবচেয়ে বিশুদ্ধ উদাহরণ হল 'ছদ্ম ক্ষমতা'র উদাহরণ। সিংহাসনের পেছনে অবস্থানকারী এই ক্ষমতা কখনো জনসমক্ষে উপস্থিত হয় না। এরা মনের কোণে সংগোপনে কেবল এই রকম ভেবে থাকে : "কারা সুতা টানছে সে সম্পর্কে এই পুতুলেরা কত সামান্যই-না জানে!" এক্ষেত্রে নিখুঁত উদাহরণ হলেন ব্যারন হলস্টিন যিনি ১৮৯০ থেকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জার্মান সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি একটি অতি সামান্য বাড়িতে বাস করতেন। কখনো তিনি সমাজের সামনে উপস্থিত হতেন না। তিনি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলতেন। একবারই কেবল সম্রাটের পীড়াপীড়ি এড়াতে না পেরে তিনি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি দরবারের সকল আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতেন এই বলে যে, তাঁর কোনো দরবারি পোশাক নেই। তিনি গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন এবং তার ফলে চ্যান্সেলর ও সম্রাটের ঘনিষ্ঠ সহচরদের অনেকেরই গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাঁদের মুখ বন্ধ রাখার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তিনি ব্লাকমেইলের এই ক্ষমতা ব্যবহার করতেন সম্পদ কিংবা খ্যাতি অর্জনের জন্য নয়, কিংবা অন্য কোনো নগদ সুবিধা লাভের জন্যও নয়, সে ক্ষমতা তিনি ব্যবহার করতেন কেবল সরকারকে তাঁর পছন্দমতো পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণে বাধ্য করার কাজে। প্রাচ্যে খোজাদের মধ্যে এ ধরনের চরিত্র নেহাত দুষ্প্রাপ্য ছিল না।

এবার আমি অন্য কতকগুলো প্রবণতার কথায় আসছি। এতক্ষণ যেসব প্রবণতা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি সেগুলোর তুলনায় এগুলো কম মৌলিক। তবু এগুলোর গুরুত্বও নগণ্য নয়। এগুলোর মধ্যে প্রথমেই আসে উত্তেজনাপ্রীতির কথা। মানুষ যে জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তার একটা

www.pathagar.com

প্রমাণ মানুষের একঘেয়েমি জনিত বিরক্তিবোধের সামর্থ্য। চিড়িয়াখানায় নৃবানরদের পরীক্ষা করতে গিয়ে কখনো কখনো আমার মনে হয়েছে যে, তাদের মধ্যেও এই অনুভূতির প্রাথমিক উপাদান বিদ্যমান। তাদের মধ্যে এই অনুর্ভূতি থাকুক বা না থাকুক, অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, একঘেয়েমি জনিত বিরক্তির হাত থেকে অব্যাহতি লাভের প্রবৃত্তি প্রায় সকল মানুষেরই একটি যথার্থ শক্তিশালী প্রবৃত্তি। সাদা মানুষেরা যখন কোনো বর্বর বন্য জাতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন তারা তাদেরকে যিশুর বাণীর আলো থেকে আরম্ভ করে মাংস ও ফল দিয়ে তৈরি পিঠা পর্যন্ত সকল প্রকার সুবিধা দানের প্রস্তাব করে। আমরা এর জন্য যতই দুঃখ করি না কেন, অধিকাংশ বর্বর জাতিই উদাসীনভাবে এগুলো গ্রহণ করে। যেসব উপহার তাদের সামনে হাজির করা হয়, সেগুলোর মধ্যে উত্তেজনাকর মদকেই তারা যথার্থ মূল্য দেয়। এই মদ তাদেরকে জীবনে প্রথমবারের মতো কিছুক্ষণের জন্য এই মোহ অনুভবে সমর্থ করে যে, নির্জীব থাকার চেয়ে সজীব থাকা ভালো। রেড ইন্ডিয়ানরা সাদা মানুষদের সংস্পর্শে আসার আগে পাইপের সাহায্যে ধূমপান করত। আমরা যেমন শান্তভাবে ধূমপান করি সেভাবে নয়, উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল হৈচৈপূর্ণ উৎসবে এত গভীর টানে তারা ধূমপান করত যে, একেবারে মূর্ছিত হয়ে পড়ত। নিকোটিনের দ্বারা উত্তেজনা যখন আর সম্ভব হত না তখন কোনো দেশপ্রেমিক বক্তা তাদেরকে পার্শ্ববর্তী গোত্রের ওপর আক্রমণ চালাতে উত্তেজিত করত। আমাদের মেজাজ অনুযায়ী আমরা ঘোড়দৌড় কিংবা সাধারণ নির্বাচন থেকে আনন্দ পাই, এ থেকে তারা ঠিক সেই আনন্দ লাভ করত। জুয়া খেলার আনন্দও প্রায় সম্পূর্ণই উত্তেজনার মধ্যে নিহিত। মর্সিয়ে হাক লিখেছেন : চীনা ব্যবসায়ীরা শীতকালে চীনের মহাপ্রাচীরে জুয়া খেলে সমস্ত টাকাকড়ি হারত, তারপর তারা বাজি রেখে রেখে সমস্ত পণ্যদ্রব্য শেষ করত, এবং শেষে তারা জুয়া খেলে পরনের কাপড় পর্যন্ত হেরে উলঙ্গ হয়ে ঠাণ্ডায় মারা যাওয়ার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ত। আমার মনে হয়, আদিম রেড ইন্ডিয়ান গোত্রগুলোর আচরণ যেমন, সভ্য মানুষদের আচরণও তেমনি : জনসাধারণ উত্তেজনাপ্রীতির কারণেই যুদ্ধের সূচনা হলে সরবে তা সমর্থন করে। আবেগটা ঠিক ফুটবল প্রতিযোগিতার আবেগের মতোই, তবে ফল কখনো কখনো গুরুতর হয়।

উত্তেজনাপ্রীতির মূল কারণ কী, তা নির্ণয় করা মোটেই সহজ নয়। আমার কল্পনা করতে ইচ্ছা করে, আমাদের মানসিক গড়নটা হচ্ছে যে পর্যায়ে মানুষ শিকারের দ্বারা জীবিকা সংস্থান করত সেই পর্যায়ের উপযোগী। মানুষ যখন

www.pathagar.com

আদিম অস্ত্রাদি নিয়ে খাবারের আশায় সারাদিন হরিণের পেছনে সংগোপনে ধাওয়া করত এবং যখন দিনের শেষে বিজয়ীর মতো হরিণের মৃতদেহ টেনে নিয়ে গুহায় উপস্থিত হত, তখন সে সন্তোষভরা ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন থাকত আর তার স্ত্রী মাংস তৈরি করে রান্না করত। সে তখন নিদ্রালু, তার হাড়ে সামান্য ব্যথা এবং রান্নার গন্ধ তার চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহমান। অবশেষে খাওয়ার পর সে ঘুমে মগ্ন হত। ওই ধরনের জীবনে একঘেয়েমিজনিত ক্লান্তিবোধ করার কোনো সময় অথবা শক্তি অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু যখন সে কৃষিকাজ অবলম্বন করল এবং তার স্ত্রীকে মাঠের সকল কঠিন কাজে পাঠাল, তখন সে মানবজীবনের অসারতা সম্পর্কে চিন্তা করার সময় পেল— সময় পেল পুরাণ সৃষ্টির, দার্শনিক চিন্তাধারা উদ্ভাবনের আর সেই পারলৌকিক জীবনের স্বপ্ন দেখার যে জীবনে সে অনন্তকাল চিরশান্তিতে বাস করবে। আমাদের মানসিক গড়ন সেই ধরনের জীবনেরই উপযোগী যে জীবন অত্যন্ত কঠোর শারীরিক শ্রমের মধ্য দিয়ে কাটে। আমার বয়স যখন কম ছিল তখন ছুটির দিনগুলোতে আমি হেঁটে বেড়াতাম। আমি দিনে পঁচিশ মাইল হাঁটতাম এবং যখন সন্ধ্যা হত তখন একঘেয়েমিজনিত ক্লান্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য কোনো কিছুরই প্রয়োজন অনুভব করতাম না, কারণ শুধু বসে থাকার আনন্দই তখন আমার পক্ষে যথেষ্ট হত। কিন্তু আধুনিক জীবন এই রকম শারীরিক শ্রমসাধ্য নীতি দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। অধিকাংশ কাজই বসে বসে করতে হয় এবং প্রায় সকল শারীরিক শ্রমের কাজের দ্বারাই কেবল বিশেষ কয়েকটি পেশিরই অনুশীলন হয়। সরকার জনসাধারণকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে— এ জাতীয় কোনো ঘোষণার সমর্থনে উল্লসিত প্রতিধ্বনি করার জন্য ট্রাফালগার স্কোয়ারে যে জনসমাবেশ হয়, সেই লোকদের সকলেই যদি পঁচিশ মাইল পথ হেঁটে আসত, তাহলে এরকম আচরণ তারা করত না। মারমুখো অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য এই নিদেনের ব্যবস্থা করা অবশ্যই সম্ভব নয়। তবে মানবজাতিকে যদি বেঁচে থাকতে হয়— যা হয়তো অনভিপ্রেত নয়— তাহলে যে অব্যবহৃত শারীরিক শক্তি উত্তেজনাপ্রবণতার জন্ম দেয়, তার নির্দোষ বহির্প্রকাশের অন্য উপায়াদি অবশ্যই উদ্ভাবন করতে হবে।

এ বিষয়টা নৈতিকতাবাদী কিংবা সংস্কারবাদী কেউই বিশেষ বিবেচনা করেন না। সংস্কারবাদীদের মত হল : বিবেচনা করার মতো আরো গুরুতর বিষয় তাঁদের রয়েছে। অপরদিকে নৈতিকতাবাদীরা উত্তেজনানুরাগের অনুমোদিত বহির্প্রকাশের উপায়সমূহের গুরুত্বের কথা ভেবেই গভীরভাবে

www.pathagar.com

চিন্তিত থাকেন। তাঁদের মন যে গুরুতর দুশ্চিন্তা দ্বারা পীড়িত তা হল পাপবোধ। আমাদের চোখ-কানের ওপর যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহলে নৃত্যশালা, রঙ্গশালা, নৃত্য-বাদ্য-সংগীতের এই কাল— সবই দোজখে যাওয়ার এক-একটি দরজা, এবং আমরা যদি কেবল ঘরে বসে আমাদের পাপের কথা ভেবে সময় কাটাই তাহলেই আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করব। এ ধরনের সতর্কবাণী উচ্চারণকারী গুরুগম্ভীর লোকদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে আমি অপারগ। শয়তানের নানা রূপ আছে, কতক রূপ তরুণদের প্রতারণা করার জন্য আর কতক বৃদ্ধ গুরুগম্ভীর লোকদের প্রতারণা করার জন্য পরিকল্পিত। যে তরুণদেরকে জীবনোপভোগে প্রলুব্ধ করে সে যদি শয়তান হয়, তাহলে যে বৃদ্ধদের সেই জীবনোপভোগের নিন্দা করার জন্য উস্কানি দেয়, সে-ও কি সেই একই শয়তান নয়? আর এই নিন্দা কি সম্ভবত নিতান্ত বৃদ্ধ বয়সের পক্ষে উপযোগী উত্তেজনারই একটা প্রকাশ মাত্র নয়? আর এই নিন্দার অভ্যাস কি আফিমের মতো একটা মাদকদ্রব্যের অভ্যাসের মতোই ব্যাপার নয়— যে অভ্যাস অভিপ্রেত ফল লাভের জন্য ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় করতে হয়? এই ভয়ও কি করতে হবে না যে, সিনেমার নষ্টামির নিন্দা দিয়ে আরম্ভ করে ক্রমে আমরা বিরোধী রাজনৈতিক দল, নীচ জাতের দক্ষিণ ইউরোপবাসী, জলপাই বর্ণের ইটালিয়ান, অসভ্য এশিয়াবাসী ইত্যাদিরও নিন্দায় অগ্রসর হব, এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্লাবের কেবল সহযোগী সদস্যদের ছাড়া আর সকলেরই নিন্দা করব? আর এ ধরনের নিন্দাই যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন তা থেকে যুদ্ধের সূচনা হয়। নৃত্যশালা থেকে কোনো যুদ্ধের সূচনা হয়েছে, এমন কথা আমি কখনো শুনিনি।

উত্তেজনা নিয়ে গুরুতর সমস্যা এই যে, এর অনেক রূপই ধ্বংসাত্মক। মদ্যপান ও জুয়া খেলায় যারা মাত্রা বজায় রাখতে সক্ষম হয় না, তাদের বেলায় উত্তেজনা ধ্বংসাত্মক। উত্তেজনা যখন জনতার নিতান্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপরূপে প্রকাশ প্রায়, তখন তা ধ্বংসাত্মক। সর্বোপরি উত্তেজনার পরিণতি যখন যুদ্ধের দিকে যায় তখন তা ধ্বংসাত্মক। উত্তেজনার তাগিদ এতই গভীর যে, নির্দোষ নিষ্ক্রমণের সুযোগ না পেলেই তা এ ধরনের ক্ষতিকর বহির্প্রকাশের পথ খোঁজে। বর্তমানে খেলাধুলার এবং শাসনতন্ত্র অনুমোদিত রাজনীতির মাধ্যমে উত্তেজনার নির্দোষ বহির্প্রকাশের উপায় আছে। কিন্তু এসব উপায় প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। আর যে ধরনের রাজনীতি সবচেয়ে উত্তেজনাকর, সেই ধরনের রাজনীতি দ্বারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধিত হয়। সভ্য জীবন একান্তই শান্ত

www.pathagar.com

জীবনে পরিণত হয়েছে। জীবনের এই অবস্থাকে যদি স্থিতিশীল করতে হয় তাহলে আমাদের দূরবর্তী পূর্বপুরুষেরা শিকারের মাধ্যমে তাদের যে প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করত আমাদের সেই প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য অবশ্যই উদ্ভাবন করতে হবে এমন পন্থা যা ক্ষতিকর নয়। অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা কম, রেবিট নামক খরগোসজাতীয় প্রাণীর সংখ্যা প্রচুর। সেখানে আমি লক্ষ করেছি, গোটা সমাজের লোকেরা তাদের আদিম প্রবৃত্তিকে আদিম নৈপুণ্যের সঙ্গে হাজার হাজার রেবিট হত্যার মাধ্যমে পরিতৃপ্ত করছে। কিন্তু লন্ডন অথবা নিউইয়র্কে আদিম প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য অন্য কোনো উপায় অবশ্যই উদ্ভাবন করতে হবে। আমার মনে হয়, প্রতিটি বড় শহরেই এমন কৃত্রিম জলপ্রপাতের ব্যবস্থা করা উচিত যা থেকে মানুষ ভঙ্গুর ক্ষুদ্র নৌকায় চড়ে নিচে নামতে পারে, আর সেগুলোতে থাকা উচিত যন্ত্রের তৈরি কৃত্রিম হাঙ্গরে পূর্ণ স্নান-সরোবর। যে লোককেই কোনো প্রতিরোধসাধ্য সংঘর্ষের পক্ষে ওকালতি করতে দেখা যায়, তাকেই দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবিত এই কৃত্রিম প্রাণীদের মধ্যে ফেলে দৈনিক দু-ঘণ্টা করে লড়তে বাধ্য করা উচিত। আরো গুরুত্বের সঙ্গে উত্তেজনানুরাগের গঠনমূলক বহির্প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। পৃথিবীতে আকস্মিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মুহূর্তের চেয়ে উত্তেজনাকর আর কিছুই নেই। কখনো কখনো ভাবা হয় যে, এই আনন্দ অর্জনের যোগ্যতা নিতান্তই স্বল্প লোকের। এ ধারণা ঠিক নয়। এই আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভের যোগ্যতা অনেক বেশি লোকের আছে।

অন্য অনেক রাজনৈতিক প্রবণতার সঙ্গে জড়িত দুটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত প্রচণ্ড অনুভূতি আছে, যেগুলো মানুষের মনকে দুঃখজনকভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে। আমি ভয় এবং ঘৃণার কথা বলছি। যাকে আমরা ভয় পাই, তাকে ঘৃণা করা স্বাভাবিক। আর এটাও ঠিক যে, যাকে আমরা ঘৃণা করি তাকে, সবসময় না হলেও অধিকাংশ সময়ই, ভয় পাই। আমার মনে হয়, আদিম মানুষদের ক্ষেত্রে এটাকে একটা নিয়ম হিসেবে ধরা যায় যে, যা-ই তাদের কাছে অপরিচিত তাকেই তারা ভয় পায় এবং ঘৃণা করে। তাদের নিজস্ব যূথ আছে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে তা খুবই ক্ষুদ্র। একটি যূথের অভ্যন্তরে শত্রুতার কোনো বিশেষ কারণ না ঘটলে সকলেই বন্ধু। অন্যান্য যূথ তাদের সম্ভাব্য কিংবা প্রকৃত শত্রু। তাদের যূথের কোনো একজন সদস্য যদি ঘটনাচক্রে যূথত্যাগী হয় তবে তাকে হত্যা করা হবে। ভিন্ন যূথকে সাধারণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হবে, কিংবা অবস্থানুসারে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে। এই আদিম যান্ত্রিক রীতিই আজো

www.pathagar.com

পর-জাতির প্রতি আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির অভিব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলছে। যে ব্যক্তি কখনো ভ্রমণ করেননি, তিনি সকল বিদেশির প্রতিই পোষণ করবেন সেই মনোভাব, যা বর্বর মানুষেরা ভিন্ন যূথের মানুষদের বেলায় করত। কিন্তু যে ব্যক্তি দেশভ্রমণ করেছেন, কিংবা আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করেছেন, তিনি আবিষ্কার করবেন যে, যদি নিজেদের যূথের উন্নতি করতে হয় তাহলে অবশ্যই কিছু পরিমাণে অপরাপর যূথের সঙ্গে মিলিত হতে হবে। আপনি যদি ইংরেজ হন এবং কেউ আপনাকে বলেন 'ফরাসিরা আপনাদের ভাই' তাহলে আপনার সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম অভিব্যক্তি হবে "বাজে কথা। তারা কাঁধ উঁচু করে বাহাদুরি দেখিয়ে হাঁটে এবং ফরাসি ভাষায় কথা বলে। এমন কথাও শুনেছি যে তারা ব্যাঙ খায়।" তিনি যদি আপনার কাছে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, রাশিয়ানদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হতে পারে; আর যদি তাই হয়, তাহলে রাইনের সীমানা রক্ষা করা প্রয়োজন হবে; আর যদি রাইনের সীমানা রক্ষা করতে হয়, তাহলে ফরাসিদের সাহায্য অপরিহার্য— তাহলে আপনি বুঝতে আরম্ভ করবেন, যখন তিনি বলেন যে ফরাসিরা আপনাদের বন্ধু তখন তদ্দ্বারা তিনি কী বোঝান। কিন্তু যদি কোনো সহযাত্রী বলতেন যে, রাশিয়ানরাও আপনাদের ভাই, তাহলে যদি তিনি মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীদের দিক থেকে ইংরেজদের কোনো বিপদের ভয় দেখাতে না পারতেন, তাহলে তিনি আপনাকে বোঝাতে সক্ষম হতেন না। আমাদের শত্রুদের যারা ঘৃণা করে তাদেরকেই আমরা ভালোবাসি এবং যদি আমাদের কোনো শত্রু না থাকত তাহলে খুব কম লোককেই আমাদের ভালোবাসার দরকার হত।

যতক্ষণ আমরা শুধু মানুষের প্রতি মানুষের মনোভাবের বিষয় বিবেচনা করি ততক্ষণই এসব সত্য। আপনি মাটিকেও আপনার শত্রু ভাবতে পারতেন, কারণ মাটি জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করে অত্যন্ত কৃপণভাবে— নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। আপনি প্রকৃতিমাতাকে সাধারণভাবে আপনার শত্রু ভাবতে পারতেন, এবং মানবজীবনকে ভাবতে পারতেন প্রকৃতিমাতার কাছ থেকে অধিক অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত একটি সংগ্রাম হিসেবে। মানুষ যদি জীবনকে এভাবে দেখত, তাহলে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সহযোগিতা সহজ হয়ে উঠত। যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ, সংবাদপত্রসমূহ এবং রাজনীতিবিদরা এই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করতেন তাহলে মানুষকে সহজেই এই জীবনদৃষ্টির দিকে নিয়ে আসা সম্ভব হত। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দেশপ্রেম

www.pathagar.com

শিক্ষাদানে তৎপর, সংবাদপত্রগুলো উত্তেজনা সৃষ্টিতে ব্যস্ত এবং রাজনীতিবিদরা পুনরায় নির্বাচিত হতে অস্থির। সুতরাং এ তিনের কেউই মানবজাতিকে পারস্পরিক আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কিছু করতে সক্ষম হয় না।

ভয়কে জয় করার দুটো উপায় আছে : একটা হল বাইরের বিপদ কমানো এবং অপরটা হল সুখ-দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকার সহিষ্ণুতা অনুশীলন। আশু ব্যবস্থা গ্রহণ যেখানে অপরিহার্য নয় সেখানে আমাদের চিন্তাধারাকে ভয়ের কারণ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে এই সহিষ্ণুতা বাড়ানো যেতে পারে। ভয়কে জয় করার গুরুত্ব অপরিসীম। ভয় মূলত চিন্তা-চেতনাকে নিম্নগামী করে এবং সহজেই তা একটা মন-আচ্ছন্নকারী বিষয়ে পরিণত হয়। মনে ভয় থাকলে যাদেরকে ভয় করা হয় তাদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ভয় সহজেই মানুষকে মাত্রাহীন নির্দয় কাজে পরিচালিত করে। নিরাপত্তার মতো আর কোনো কিছুরই মানুষের ওপর মঙ্গলকর ক্রিয়া নেই। যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারার মতো একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা গেলে অতি দ্রুতগতিতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন মনোবৃত্তির অপরিসীম উৎকর্ষ সাধিত হত। পৃথিবীব্যাপী ভয় এখন সবকিছুকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দুষ্ট কমিউনিস্ট কিংবা দুষ্ট পুঁজিবাদী— যার দ্বারাই ব্যবহৃত হোক— আণবিক বোমা ও জীবাণু বোমা ওয়াশিংটন ও ক্রেমলিনকে প্রকম্পিত রাখে এবং মানুষকে আরো রসাতলের দিকে ঠেলে দেয়। অবস্থার যদি উন্নতি ঘটাতে হয় তাহলে অপরিহার্য প্রথম পদক্ষেপ হবে ভয় দূর করার একটা উপায় বের করা।

পৃথিবী এখন প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদের সংঘাতের দ্বারা অন্ধভাবে পরিচালিত, এবং সংঘর্ষের একটি সুস্পষ্ট কারণ হল নিজেদের মতবাদের বিজয় ও অন্যদের মতবাদের পরাজয় কামনা। আমার মনে হয় না যে, মূল উদ্দেশ্য এখানে আদর্শের সঙ্গে খুব একটা সম্পর্কশীল। আমি মনে করি, আদর্শ হল মানুষকে দলবদ্ধ করার একটা উপায় মাত্র, আর কার্যকর মনোবৃত্তিটা হল যে কোনো ক্ষেত্রে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে যে মনোবৃত্তি জাগে, তাই। কমিউনিস্টদের ঘৃণা করার অবশ্য বিভিন্ন কারণ আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ হল আমাদের এই বিশ্বাস যে, তাঁরা আমাদের সম্পত্তি নিয়ে নিতে চায়। কিন্তু সিঁদেল চোরেরাও তাই করে। চোরদের আমরা অনুমোদন করি না ঠিক, তবে কার্যত তাদের প্রতি আমাদের মনোভাব কমিউনিস্টদের প্রতি আমাদের মনোভাব থেকে অনেক ভিন্ন। এরূপ হওয়ার প্রধান কারণ, সিঁদেল চোরেরা সমপরিমাণ

www.pathagar.com

আতঙ্ক সৃষ্টি করে না। কমিউনিস্টদেরকে আমাদের ঘৃণা করার দ্বিতীয় কারণ, তারা ধর্মহীন। কিন্তু চীনারা একাদশ শতক থেকেই ধর্মহীন; অথচ আমরা তাদেরকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি যখন তারা চিয়াংকাইশেককে তাড়িয়েছে তখন থেকে। কমিউনিস্টদেরকে আমাদের ঘৃণা করার তৃতীয় কারণ, তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এ কারণে ফ্রাঙ্কোকে ঘৃণা করার প্রয়োজন আমরা বোধ করি না। কমিউনিস্টদেরকে আমাদের ঘৃণা করার চতুর্থ কারণ হল, তারা স্বাতন্ত্র্য অনুমোদন করে না। এটা আমরা এতই তীব্রভাবে অনুভব করি যে, আমরা তাদেরকে অনুকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসবের কোনোটাই যে আমাদের ঘৃণার প্রকৃত কারণ নয়, তা স্পষ্ট। তাদের প্রতি আমাদের ঘৃণার কারণ, তাদেরকে আমরা ভয় পাই, এবং তারা আমাদেরকে হুমকি দেয়। রাশিয়ানরা যদি এখনো গ্রিকদের গোঁড়া ধর্ম অবলম্বন করে থাকত, যদি তারা সংসদীয় গণতন্ত্র চালু রাখত এবং যদি তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন সংবাদপত্র থাকত, আর সংবাদপত্রের মাধ্যমে যদি তারা প্রতিদিন আমাদেরকে গালাগালি করত, তাহলেও তাদের এখনকার মতো শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী থাকলে এবং তাদেরকে আমাদের শত্রু ভাবার মতো কারণ তারা সৃষ্টি করে রাখলে তাদেরকে আমরা ঘৃণাই করতাম। শত্রুতার কারণ অবশ্য ঈশ্বর সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণকারীদের প্রতি বিরূপ মনোভাবও হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, তা যূথবদ্ধ জীবনের অনুভূতিরই একটা শাখা : যে লোকের ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা ভিন্ন তার অনুভূতি অপরিচিত এবং যা অপরিচিত তা-ই বিপজ্জনক। প্রকৃতপক্ষে মতাদর্শ হল যূথ গড়ে তোলার একটা উপায়, আর যূথ যেভাবেই গড়ে উঠুক, মনস্তত্ত্বটা সর্বত্রই এক।

আপনারা মনে করে থাকতে পারেন যে, আমি কেবল খারাপ প্রবণতাসমূহের, কিংবা বড়জোর নৈতিক বিচারে নিরপেক্ষ প্রবণতাসমূহের কথাই চিন্তা করেছি। আমাদের আলোচিত এসব প্রবণতা, সাধারণভাবে, অধিকতর লোকহিতকর প্রবণতাসমূহ থেকে বেশি শক্তিশালী— এমন একটা ভীতিপূর্ণ ধারণা আমার আছে; তবে লোকহিতকর বৃত্তির অস্তিত্ব আমি অস্বীকার করি না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে মনোবৃত্তি যে কার্যকরও হতে পারে তা আমি স্বীকার করি। দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের উনিশ শতকের প্রথম দিককার আন্দোলন যে লোকহিতকর ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং তা সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয়েছিল। ১৮৩৩ সনে ব্রিটিশ করদাতারা জামাইকার ভূস্বামীদেরকে তাদের দাসদের মুক্তিদানের জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে কোটি কোটি টাকা পরিশোধ করেছে, তা

www.pathagar.com

এই আন্দোলনের লোকহিতবাদিতারই প্রমাণ। এ ঘটনা দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভিয়েনার কংগ্রেসে ব্রিটিশ সরকার অন্যান্য জাতিকে দাসপ্রথা পরিহারে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা দানের জন্য তৈরি ছিল। এটা অতীতের উদাহরণ। কিন্তু আজকের আমেরিকায়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ মেলে। অবশ্য আমি এসবের আলোচনায় প্রবেশ করব না, কারণ চলতি বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা আমার নেই।

সহানুভূতি যে একটা অকৃত্রিম অনুভূতি এবং কখনো কখনো কোনো কোনো লোক যে অন্যদের দুর্দশায় অস্বস্তি বোধ করেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। সহানুভূতির ফলেই গত একশ বছরে অনেক লোকহিতকর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পাগলদের প্রতি নির্দয় ব্যবহারের কথা শুনলে আমরা দুঃখিত হই, এবং এখন অনেক আশ্রম হয়েছে যেখানে পাগলদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করা হয় না। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে কয়েদিদেরকে পীড়ন করা হয়— এমনটা কেউ বিশ্বাস করেন না। যদি কখনো তাদেরকে পীড়ন করা হয় এবং সেই পীড়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে। 'ওলিভার টুইস্টে' অনাথদের প্রতি যে রকম আচরণের সাক্ষাৎ মেলে, সে রকম আচরণ আমরা অনুমোদন করি না। প্রটেস্টান্ট দেশগুলোতে পশুদের প্রতি নির্দয়তা অনুমোদিত নয়। এসব উপায়ে সহানুভূতি রাজনৈতিকভাবে কার্যকর হয়েছে। যদি যুদ্ধের ভয় দূর করা হত তাহলে এর কার্যকারিতা আরো অনেক বেশি হত। সম্ভবত মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় আশা এটাই যে, সহানুভূতির পরিধি ও গভীরতা বৃদ্ধি করার উপায় উদ্ভাবিত হবে।

এখন সময় হয়েছে বক্তব্যের সারসঙ্কলনের। দেখা যাচ্ছে রাজনীতির সংযোগ ব্যক্তির চেয়ে যূথের সঙ্গেই বেশি; এবং সেজন্যই কোনো যূথের বিভিন্ন সদস্য যেসব আবেগ একইভাবে অনুভব করতে পারে, সেগুলোই রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতির সৌধমালা বৃত্তি-প্রবৃত্তিগত যে বিস্তৃত প্রণালী অনুযায়ী গড়ে ওঠে তা হল, নিজেদের যূথের মধ্যে সহযোগিতা ও অন্য যূথের প্রতি শত্রুতা। যূথে অভ্যন্তরীণ সহযোগিতা কখনো পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। কিছু সদস্য থাকেন যাঁরা স্বাধীনচেতা, যাঁরা সবকিছু মেনে চলেন না, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যাঁরা 'অসাধারণ' অর্থাৎ যূথের বাইরে। এই সদস্যদের অবস্থান হয় সাধারণ স্তরের নিচে, না হয় সাধারণ স্তরের উপরে। তারা হয় বোকা ও অপরাধী, নাহয় নবী-অবতার ও আবিষ্কারক-উদ্ভাবক। একটি বিচক্ষণ যূথ শিখবে, কেমন করে যারা সাধারণ স্তরের উপরে তাদের বিশিষ্টতাকে সহ্য করতে হয় এবং যারা সাধারণ

www.pathagar.com

স্তরের নিচে তাদের প্রতি অহিংস আচরণ করতে হয়। অন্য যূথের সঙ্গে সম্পর্কের বেলায় আধুনিক রীতি, আত্মস্বার্থ ও সহজাত প্রবৃত্তি— এ দুয়ের মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি করেছে। আগের দিনে দুটি গোত্র যখন যুদ্ধে নামত তখন একটি অপরটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করত এবং পরাজিতদের রাজ্যকে বিজয়ীরা নিজেদের রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে নিত। বিজয়ীর দিক থেকে সমস্তটা অভিযানই হত পরিপূর্ণভাবে সন্তোষজনক। তখন হত্যাকাণ্ড সাধন কোনো ব্যয়বহুল ব্যাপার ছিল না, আর উত্তেজনাটাও অশোভন ছিল না। সে অবস্থায় যুদ্ধ যে লেগে থাকত, তা দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দুঃখের বিষয়, আমাদের আবেগসমূহ এখনো এ ধরনের আদিম যুদ্ধের অনুকূল, কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত অভিযানের রূপ এখন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আধুনিক যুদ্ধে শত্রুহত্যার অভিযান অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আপনারা যদি চিন্তা করেন, গত যুদ্ধে কতজন জার্মান নিহত হয়েছে এবং বিজয়ীরা আয়কর হিসেবে কত দিচ্ছে, তাহলে লম্বা অঙ্কের ভগ্নাংশে আপনারা একজন মৃত জার্মানের মূল্য নির্ণয় করতে পারবেন, এবং আপনাদের কাছে তা যথাযোগ্য বলেই মনে হবে। এ কথা সত্য যে, প্রাচ্যে জার্মানদের শত্রুরা পরাজিত জনসাধারণকে বিতাড়িত করার এবং তাদের ভূমি দখল করে নেওয়ার আদিম সুবিধাসমূহ লাভ করেছে। পাশ্চাত্যের বিজয়ীরা অবশ্য এরকম কোনো সুবিধা অর্জন করতে পারেনি। এটা স্পষ্ট যে, আধুনিক যুদ্ধ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মোটেই সুবিধাজনক ব্যবসা নয়। দুটি বিশ্বযুদ্ধেই অবশ্য আমাদের জয় হয়েছে, তবু, যদি যুদ্ধ দুটি না ঘটত তাহলে আমরা আরো অনেক সমৃদ্ধিশালী হতে পারতাম। মানুষ যদি আত্মস্বার্থপ্রণোদিত হয়ে কাজ করত, তাহলে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সহযোগিতা দেখা দিত। কিন্তু কেবল স্বল্পসংখ্যক ঋষি ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকেই আত্মস্বার্থপ্রণোদিত দেখা যায় না। যদি আত্মস্বার্থের বোধ মানবজীবনের চালিকাশক্তি হত, তাহলে পৃথিবীতে আর কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হত না, কোনো স্থলবাহিনী থাকত না, নৌবাহিনী থাকত না, আণবিক বোমা থাকত না। এমন কোনো প্রচারক বাহিনীও থাকত না, যারা খ-জাতির বিরুদ্ধে ক-জাতির এবং ক-জাতির বিরুদ্ধে খ-জাতির মনকে বিষিয়ে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত হত। বিদেশের উৎকৃষ্টতম বইপত্র ও চিন্তাভাবনাও যাতে দেশের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য সীমান্তের যে আমলা বাহিনী কর্মতৎপর, তারাও থাকত না। যেখানে একটি বৃহৎ কর্মোদ্যোগ আর্থিক দিক দিয়ে অধিক লাভজনক সেখানে অনেকগুলো ক্ষুদ্র কর্মোদ্যোগের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য কোনো শুল্ক-প্রতিবন্ধক থাকত না।

www.pathagar.com

প্রতিবেশীদের দুর্দশা যত তীব্র উৎকণ্ঠার সঙ্গে মানুষ কামনা করে, ততটা উৎকণ্ঠার সঙ্গে যদি তারা নিজেদের সুখ কামনা করত, তাহলে এই সবকিছুই অতি দ্রুতগতিতে ঘটত। কিন্তু আপনারা আমাকে প্রশ্ন করবেন, এই কল্পস্বর্গের স্বপ্ন দেখে কী লাভ? নৈতিকতাবাদীরা যত্নবান হবেন যাতে আমরা সম্পূর্ণ স্বার্থপর হয়ে না পড়ি; অথচ সম্পূর্ণ স্বার্থপর যদি আমরা না হই তাহলে ভবিষ্যতের সেই প্রত্যাশিত স্বর্ণযুগ— যখন স্বয়ং যিশু সশরীরে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে সহস্র বৎসর রাজত্ব করবেন— সম্ভব হবে না।

আমি চাই না যে, একটা নৈরাশ্যপূর্ণ বীতশ্রদ্ধ কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ হোক। আমি অস্বীকার করি না যে, স্বার্থপরতার চেয়েও উৎকৃষ্ট জিনিস আছে, এবং কেউ কেউ সেসব জিনিসও অর্জন করেন। তবে আমি মনে করি, স্বার্থপরতাকে যদি কুসংস্কারমুক্ত আত্মস্বার্থ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে রাজনীতিক্ষেত্রে, একদিকে এমন উপলক্ষ নিতান্ত কমই পাওয়া যাবে যাতে বিরাট জনতা স্বার্থপরতার উপরে উঠতে পারে, এবং অপরদিকে এমন উপলক্ষ প্রচুর পাওয়া যাবে যাতে জনসাধারণ স্বার্থপরতার আওতায় পড়বে।

আর যেসব ঘটনায় জনসাধারণ আত্মস্বার্থের আওতায় থাকে সেগুলোর বেলায়ও প্রায় সকল ক্ষেত্রে তাদের মনে এই ধারণা জাগানো হয় যে, তারা আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। আদর্শপরায়ণতার নামে যা চালানো হচ্ছে তার অধিকাংশই হয় ছদ্মঘৃণা নাহয় ছদ্ম ক্ষমতানুরাগ। বিপুল জনসাধারণকে যখন আপনারা কোনো মহৎ অনুপ্রেরণার নামে আন্দোলিত হতে দেখেন, তখন আপনাদের কর্তব্য, একটু গভীরে দৃষ্টি দিয়ে নিজেদের অন্তরকে জিগ্যেস করা : এই অনুপ্রেরণার পেছনে ক্রিয়াশীল প্রকৃত কারণটা কী? মহত্ত্বের এতই আকর্ষণ যে, তার মুখোশ দেখলেই মানুষ তার পেছনে ধাবিত হয়। অংশত এই কারণেই, যে ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের চেষ্টা আমি করছি তা করা গুরুত্বপূর্ণ। পরিশেষে বলব, আমার বক্তব্য যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীকে সুখকর করে তোলার জন্য প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিস হল বুদ্ধি। আর সব রকমের বিবেচনার পরেও, এই সিদ্ধান্ত আশাবাদী; কারণ বুদ্ধির বিকাশ শিক্ষার জ্ঞাত পদ্ধতির সাহায্যে ঘটানো যায়।

www.pathagar.com

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841804263202